উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

২য় সেমিস্টার

ভাষাতত্ত্ব

কোর পত্র - ২০১

পর্যায় - খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক-১ ভাষা আলোচনার রীতি পদ্ধতি ও ভাষাতত্ত্বের শাখা-

একক-২ ভাষার শ্রেণীবিভাগ

একক-৩ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের ক্রমবিকাশ

একক-৪ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

একক-৫ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিবরণ

একক-৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ

একক-৭ পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রত্ন-নব্য ভারতীয়-আর্যের উপভাষা

পর্যায় খ

একক-৮ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষা

একক-৯ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষার পরিচয়

একক-১০ বাংলা উপভাষার স্তরবিভাজন এবং বাংলা শব্দভাণ্ডার

একক-১১ ধ্বনিতত্ত্ব

একক-১২ শব্দার্থতত্ত্ব

একক-১৩ রূপতত্ত্ব

একক-১৪ বাক্যতত্ত্ব

কোর পত্র - ২০১ - ভাষাতত্ত্ব

একক-৮

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষা- নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য, নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ, বাংলা ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস, বাংলা ভাষার শ্রেণীবিভাগ, বাংলা ভাষা বিবর্তনের চিত্র

একক-৯

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষার পরিচয়- প্রাচীন বাংলা ভাষার ভূমিকা, প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, মধ্য বাংলা ভাষার ভূমিকা, আদি-মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তন, অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তন, আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

একক-১০

বাংলা উপভাষার স্তরবিভাজন এবং বাংলা শব্দভাণ্ডার- বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা ও শ্রেণীবিভাগ, উদাহরণসহ আঞ্চলিক উপভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য, বাংলা শব্দভাণ্ডার, রাজ্য পরিচালনা বিষয়ক মুসলমান সংস্কৃতি-বিষয়ক শব্দ, বিদেশী ইউরোপীয় থেকে বিভিন্ন শব্দ, দেশী গৃহীত শব্দ

একক-১১

ধ্বনিতত্ত্ব- ধ্বনিতত্ত্ব, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন ও তার কারণ, ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

একক-১২

শব্দার্থতত্ত্ব- শব্দার্থের পরিচয়, শব্দার্থ নিরূপণ পদ্ধতি, শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের কারণ, অর্থপরিবর্তনের ধারা, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি

একক-১৩

রূপতত্ত্ব- রূপতত্ত্ব-ভূমিকা, রূপতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ, লিঙ্গের ধারণা, বচনের ধারণা, কারকের ধারণা, সর্বনামের ধারণা, ক্রিয়ার ধারণা

একক-১৪

বাক্যতত্ত্ব- বাক্যতত্ত্ব-ভূমিকা,বাংলা বাক্যের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ, শুদ্ধ বাক্যের ত্রি-সূত্র, বাক্যের পদবিধি

একক-৮ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষা

বিন্যাস ক্রম

৮.১। নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

৮.২। নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ

৮.৩। বাংলা ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস

৮.৪। বাংলা ভাষা উদ্ভবের শ্রেণীবিভাগ

৮.৫। নির্বাচিত প্রশ্ন

৮.৬। সহায়ক গ্রন্থ

৮.১। নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় আর্যভাষার নব্যস্তরে উত্তরণ ঘটেছিল ধ্বনিতে, পদরূপে এবং পদপ্রয়োগে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির বহু বিচিত্রতা থাকলেও তাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল ঃ-

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় পূর্বস্তরের বিষম ব্যঞ্জন-সংযোগ সমীভূত হয়েছিল। সমীভূত এইসব যুক্তব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একব্যঞ্জনে পরিণত হল এবং তার পূর্ববর্তী স্বর হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ হল। যুক্তব্যঞ্জন একব্যঞ্জনে পরিণত হওয়ার ফলে স্বরের এই দীর্ঘ হওয়াকে 'পরিপূরক দীর্ঘিকরণ' বলা হয়। পাঞ্জাবী ও সিন্ধি ভাষায় একব্যঞ্জনে পরিণতি ঘটে না। যেমন ঃ- হস্ত > হাথ (হিন্দি, গুজরাতি) > হাত (বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া) > হত্থ (পাঞ্জাবি) > হত্থু (সিন্ধি); চূর্ণক > চুন (বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া) > চুনো (গুজরাতি) > চূনা (হিন্দী, মারাঠী) > চুন্নু (সিন্ধি); উষ্ট্র > উঁট (হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠী) > উট (বাংলা, অসমিয়া) > ওট (ওড়িয়া) > উট্ঠু (সিন্ধি)।

২। অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত অনুনাসিক ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে যখন পূর্ববর্তী স্বরকে সানুনাসিক করে তখন ব্যঞ্জনটি একলা পড়ে থাকে ও তার পূর্ববর্তী ঐ সানুনাসিক স্বর

মন্তব্য

পরিপূরক দীর্ঘীকরণ প্রাপ্ত হয়। যেমন ঃ- শুষ্ঠি > সুঁঠ (মারাঠী, গুজরাতি, বাংলা, অসমিয়া) > সোঁঠ (হিন্দি) > সুন্ট্ (পাঞ্জাবি) > সুণ্টি (সিন্ধি); পঞ্চ > পাঁচ (বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, গুজরাতি, মারাঠী) > পঞ্চ (পাঞ্জাবি) > দন্দু (সিন্ধ্রি)।

৩। স্বরমধ্যবর্তী স্পর্শব্যঞ্জন মধ্যভারতীয় আর্যভাষা স্তরে অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হওয়ায় যেসব স্বরধ্বনি পাশাপাশি পড়ে থাকে, তাদের বলে 'উদ্বৃত্তস্বর'। এদের পরিণতি মোটামুটি তিন রকমের হয়ে থাকে। - ক) সন্ধিসূত্রে যেমন- গঅ + ইল্ল > গেল (বাংলা, মারাঠী, অসমিয়া); খ) একটির লোপ হয় যেমন - ঘৃত > ঘিঅ > ঘি (বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি); গ) দ্বিস্বরে (dipthong) পরিণত হয়ে যেমন- মধু > মউ > মৌ (বাংলা, অসমিয়া)।

৪। শব্দরূপে অনেক পরিবর্তন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় দেখা দিল। পদান্তের স্বর দিয়ে যে লিঙ্গ -বৈশিষ্ট্য নিরূপণ হত কালক্রমে তার পরিবর্তনে লিঙ্গ-পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে হয় লুপ্ত হয়েছে অথবা বিচিত্রতা লাভ করেছে। বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়ায় পুং, স্ত্রী ও ক্লীবলিঙ্গের ভেদ প্রায়ই রইল না। হিন্দি ও পাঞ্জাবিতে 'দহীঁ' পুংলিঙ্গ, সিন্ধিতে 'দহী' স্ত্রীলিঙ্গ এবং মারাঠী ও গুজরাতিতে 'দহিঁ' ক্লীবলিঙ্গ।

৫। বহুবচনের জন্য শব্দরূপে যে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার হত তার অবশেষ সামান্যই আছে। যেমন ঃ- সিন্ধি পিউন < পিতরঃ; মারাঠীতে মালা < মালাঃ।

৬। নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলিতে শব্দরূপে বিভিন্ন কারক বোঝাতে প্রাচীন বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়েছে। কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। যেমন ঃ- কর্তা প্রভৃতিতে শূণ্য বিভক্তি এবং / -এ, -ও / বিভক্তি; অধিকরণে / -ই, -এ / বিভক্তি।

৭। সমাপিকা ক্রিয়াপদে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অনেক ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরেই প্রায় লুপ্ত। অতীত কালে নিষ্ঠা প্রত্যয় / -ক্ত/ অথবা নূতন / -ইল্ল, -অল্ল / প্রত্যয় জাত প্রত্যয়ের এবং ভবিষ্যতে /তব্য/ জাত /-অব/ বা /-ইব/ প্রত্যয়ের ব্যবহার নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে দেখা যায়। কোনো কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষায় বর্তমান অসম্পন্ন /-শতৃ/ প্রত্যয়জাত, /-ইত/ প্রত্যয়ও দেখা যায়। যেমন- মৈথিলিতে /হোত্/ বাংলায় /হইতে/।

৮। প্রাচীন ভাষার কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের ব্যবহারে অনেক পার্থক্য এসেছে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে, সেখানে কর্মবাচ্যের রূপ বদলে গিয়ে কর্তৃবাচ্যেরই রূপ পেয়েছে। যেমন ঃ- / ময়া পুস্তিকা পাঠিতা / > / আমি পুথি পড়ি / (বাংলা)। মন্তব্য

৯। প্রাচীন কর্মবাচ্যের বিকরণ /-য/ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রমশ /-ইয়/ ও / ইজ্জ/ রূপে এবং কখনো প্রয়োজক বিকরণ /-আপয় > আ / রূপে ব্যবহৃত হলেও যৌগিক কর্মবাচ্যের পদই এই ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ- / তাকে দেখা যাচ্ছে / (বাংলা) > / বহ্ দেখা জাতা হ্যায় / (হিন্দি)।

১০। কর্মবাচ্যে ভাববাচ্য ছাড়া অন্যান্য বহু অর্থে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার অর্থাৎ সহায়ক ক্রিয়া সংযোগের বৈচিত্র্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ক্রিয়াপদের সংশ্লেষক বিশেষত্ব এইভাবে বিশ্লেষক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। যেমন ঃ- / আমি চাইছি (বাংলা) /; /মৈঁ চাহ্তা হুঁ (হিন্দি) /; / মুক্সে বণ্দ্যুঁ আহিন (সিন্ধি/ /; / ম্যাঁ চাহন্দাঁ হাঁ (পাঞ্জাবি /; / মনে গমে হে (গুজরাতি) / ইত্যাদি।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। 'উদ্বৃত্তস্বর' কাকে বলে?

উত্তর ঃ স্বরমধ্যবর্তী স্পর্শব্যঞ্জন মধ্যভারতীয় আর্যভাষা স্তরে অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হওয়ায় যে-সব স্বরধ্বনি পাশাপাশি পড়ে থাকে, তাদের বলে 'উদ্বৃত্তস্বর'।

২। বহুবচনের জন্য শব্দরূপে যে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার হত তার দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ সিন্ধি পিউর < পিতরঃ; মারাঠী মালা < মালাঃ।

৮.২। নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ

হর্নলে সাহেবের মতে আর্যদের যে-দল প্রথমে গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর ও সমৃদ্ধক্ষেত্রে বসতি স্থাপন করেছিল; পরবর্তীকালে অন্য একটি আর্যদল, যাদের উপভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন, তারা ঐ স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। যে- ভাষাবর্গ পরবর্তীকালে ঐ মধ্যাঞ্চলে

মন্তব্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিকে বলা হয়েছে অন্তবর্গ (Inner Group)। আর ঐ অঞ্চলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া ভষাবর্গকে বলা হয়েছে বহির্বর্গ (Outer Group)। বহির্বর্গের ভাষাগুলিকে অঞ্চল অনুযায়ী তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ১) উত্তর-পশ্চিমে-পশ্চিমা পাঞ্জাবি ও সিন্ধি ও জিপসী বা যাযাবরী ভাষা। ২) দক্ষিণে-মারাঠী ও সিংহলী ভাষাগুচ্ছ আর ৩) পূর্বে-বিহারী, ওড়িয়া, বাংলা, অসমিয়া ভাষাগুচ্ছ।

বহির্বগের ভাষায় নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি দেখা যায় ঃ-

১। পদান্ত ই-কার, উ-কার ও এ-কারের অলোপ।

২। অপিনিহিতি।

৩। ই-কার ও উ-কারের যথাক্রমে এ-কার ও ও-কার রূপে উচ্চারণ।

৪। উ-কারের ই-কারে পরিবর্তন।

৫। দ্বিস্বর ঐ-কারের ও ঔ-কারের দুই স্বরে পরিণতি অর্থাৎ ই > অই > এ; ঔ > অউ > ও।

৬। ‘ঙ’, ‘ঞ’ ধ্বনির অস্তিত্ব।

৭। ল > র, ড > ড়, দ > ড, ড > দ, দ > জ, -স্ব > ব স্বরমধ্যবর্তী-র-এর লোপ, স্বরমধ্যবর্তী স > হ, স (ষ) > শ।

৮। মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা।

৯। যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি।

১০। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়।

১১। ‘ভূ’ ও ‘স্থা’ ধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দের দ্বারা পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রকাশ।

১২। অনুসর্গ-স্থানীয় শব্দলাগে বহুবচনের পদ গঠন।

১৩। অতীতকালে সকর্মক ধাতুর কর্তায় এবং কর্মের বিশেষণরূপে নিষ্ঠান্ত শব্দের ব্যবহার।

১৪। তদ্ধিত ‘ল’-প্রত্যয়ের যোগ। মন্তব্য

১৫। ‘আছ্’ ধাতুর ব্যবহার।

ড. সুকুমার সেন নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন ঃ-

১। যুগ্মধ্বনির সরলতার অর্থাৎ একটি ধ্বনি হওয়ার দিকে অনিবার্য ঝোঁক এবং তার ফলে অক্ষরে মাত্রাসমতা রাখবার জন্য, পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘতাপ্রাপ্তি।

২। পদমধ্যে, শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার না থাকলে, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির সন্ধিপ্রবণতা বা সংশ্লেষ (contraction)।

৩। লুপ্ত প্রাচীন বিভক্তির স্থানে নূতন বিভক্তির প্রচলন এবং বিভিন্ন স্থানীয় (অনুসর্গ) ব্যবহার। নূতন করে ‘স্ত্রীলিঙ্গ’ সৃষ্টি। ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার হ্রাস ও লোপপ্রবণতা।

৪। নিষ্ঠাপ্রত্যয় ও শতৃপ্রত্যয়জাত বিশেষণ পদ থেকে অতীত ও ভবিষ্যতকালের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি। যৌগিক কালের ব্যবহার। প্রাচীন কাল ভাবের মধ্যে শুধু বর্তমান (দৈবাৎ ভবিষ্যৎ) এবং অনুজ্ঞা রইল।

৫। বাক্যরীতি সিদ্ধপ্রয়োগ অনুযায়ী, পদপ্রয়োগ সংস্থানগত। যেমন ঃ- ছেলেটি ভালো (বাক্য); ভালো ছেলেটি (বিশেষণ বিশেষ্যময় বাক্যংশ)। প্রথম উদাহরণে ‘ভালো’ শেষে বসে বিধেয় বিশেষণরূপে বাক্য সম্পূর্ণ করেছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘ভালো’ বিশেষ্যের পূর্বে বসেছে বলে সাধারণ বিশেষ্য।

৬। ছন্দের পদ্ধতি সমমাত্রিক ও মাত্রামূলক এবং পরে কোথাও কোথাও অক্ষরমূলক।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। অন্তর্বর্গ কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে ভাষাবর্গ পরবর্তীকালে মধ্যাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে বলা হয় অন্তর্বর্গ (Inner Group)।

মন্তব্য

২। বহির্বর্গ কাকে বলে?

উত্তর ঃ মধ্যাঞ্চলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া ভাষাবর্গকে বহির্বর্গ (Outer Group) বলা হয়।

৩। বহির্বর্গের ভাষাগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর ঃ বহির্বর্গের ভাষাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

৮.৩। বাংলা ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস

সারা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে কয়েকটি ভাষাবংশে বর্গীকৃত করা হয়েছে - ১) ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European or Aryan), ২) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic), ৩) বান্টু (bantu), ৪) ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian), ৫) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turk-Mongol-Mancha), ৬) ককেশীয় (Cancasian), ৭) দ্রাবিড় (Dravidian), ৮) অস্ট্রিক (Austric), ৯) ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan), ১০) উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean), ১১) এস্‌কিমো (Esquimo), ১২) আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি (American Indian Languages) ইত্যাদি।

এইসব ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষাবংশটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই ভাষাবংশ থেকে জাত আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বহু অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়ত শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বংশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টিতে এত বেশি সমৃদ্ধ যে ইংরেজ কবি নাট্যকার শেক্সপীয়র, জার্মান কবি-নাট্যকার গ্যেটে, শীলার, কবি রিল্‌কে, ফরাসী সাহিত্যিক ভল্‌তেয়র, মলেয়র, মালার্মে, ভালেরি, ইতালীয় কবি পেত্রার্ক, দান্তে নন্দনতত্ত্ববিদ্ ক্রোচে আর বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান এখন কোনো ভাষা বিশেষের বা ভাষাবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়;

সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যেরই সম্পদ রূপে বিবেচিত। মন্তব্য

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এই বিস্তারের পরে তাদের ভাষায় ক্রমশ আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে প্রথমে দশটি প্রাচীন ভাষা বা প্রাচীন শাখার জন্ম হল। এগুলি হল ঃ- ১) ইন্দো-ইরানীয়, ২) বালতো-স্লাভিক, ৩) আলবানীয়, ৪) আর্মেনীয়, ৫) গ্রীক, ৬) ইতালিক বা লাতিন, ৭) টিউটনিক বা জার্মানিক, ৮) কেলটিক, ৯) তোখারীয় এবং ১০) হিট্টীয়।

ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায় ঃ- ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। ইরানীয় উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। তার প্রাচীনতম সাহিত্য-কীর্তি হল 'অবেস্তা' নামক ধর্মগ্রন্থ। ভারতীয়

আর্যভাষার প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে বিবর্তনের স্তরভেদে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ-

১। **প্রাচীন ভারতীয় আর্য ঃ-** আনুমানিক ১৫০০ খ্রি.পূ. থেকে ৬০০ খ্রি.পূ. পর্যন্ত। এ যুগের আর্যভাষার আর্যভাষার নাম বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঋক-সংহিতা।

২। **মধ্য ভারতীয় আর্য ঃ-** আনুমানিক ৬০০ খ্রি.পূ. থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এযুগের আর্যভাষার নাম পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, জৈন ধর্মগ্রন্থে ও কিছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি এ যুগের ভাষার নিদর্শন।

৩। **নব্য ভারতীয় আর্য ঃ-** আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার নাম- বাংলা, হিন্দি, মারাঠী, পাঞ্জাবি, অবধী ইত্যাদি। নানা সাহিত্য গ্রন্থ ও আধুনিক ভারতী আর্যদের মুখের ভাষাই এর নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ ছিল ঃ- সাহিত্যিক ও কথ্য। কথ্য রূপটির

মন্তব্য

চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল- প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে তার চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য রূপগুলি থেকে প্রাকৃত্যের এই কথ্য উপভাষাগুলির জন্ম এইভাবে অনুমান করতে পারি ঃ প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্যমধ্যা প্রাকৃত, উদীচ্য থেকে উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত এবং মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত।

অপভ্রংশ-অবহট্ঠের পরে ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করল। তখন এক-একটি অপভ্রংশ অবহট্ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করল। যেমন ঃ- পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে পাঞ্জাবি; মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে হিন্দি, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হল।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। কারণ প্রথমত সংস্কৃত ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বংশের ভাষা। কিন্তু ভারতে আর্য-পূর্ব দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি বংশের অনেক ভাষা (তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, সাঁওতালি প্রভৃতি) আছে যেগুলির জন্ম সংস্কৃত থেকে বলা নিতান্ত মূর্খতা মাত্র। দ্বিতীয় পাঞ্জাবি, মারাঠী, হিন্দি, অবধী, বাংলা প্রভৃতি যেসব আধুনিক ভারতীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বংশ থেকে জাত, সেগুলির জন্ম ঠিক সংস্কৃত থেকে হয় নি। নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস হল বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে জাত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তর বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষা। আমরা দেখছি বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে।

আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষারূপে বাংলা ভাষা এখনো জীবন্ত রয়েছে। আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করা যায় ঃ-

১। প্রাচীন বাংলা (Old Bengali) ঃ- আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

২। মধ্য বাংলা (Middle Bengali) ঃ- আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মন্তব্য

৩। আধুনিক বাংলা (New Bengali) ঃ- আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে জাত কয়েকটি ভাষার নাম লেখো।

উত্তর ঃ ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাভিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি।

২। ইন্দো-ইরানীয় শাখার দুটি উপশাখার নাম লেখো।

উত্তর ঃ ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য।

৩। প্রাচীন বাংলা সময়কাল কত?

উত্তর ঃ প্রাচীন বাংলার সময়কাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মন্তব্য

৮.৪। বাংলা ভাষা উদ্ভবের শ্রেণীবিভাগ

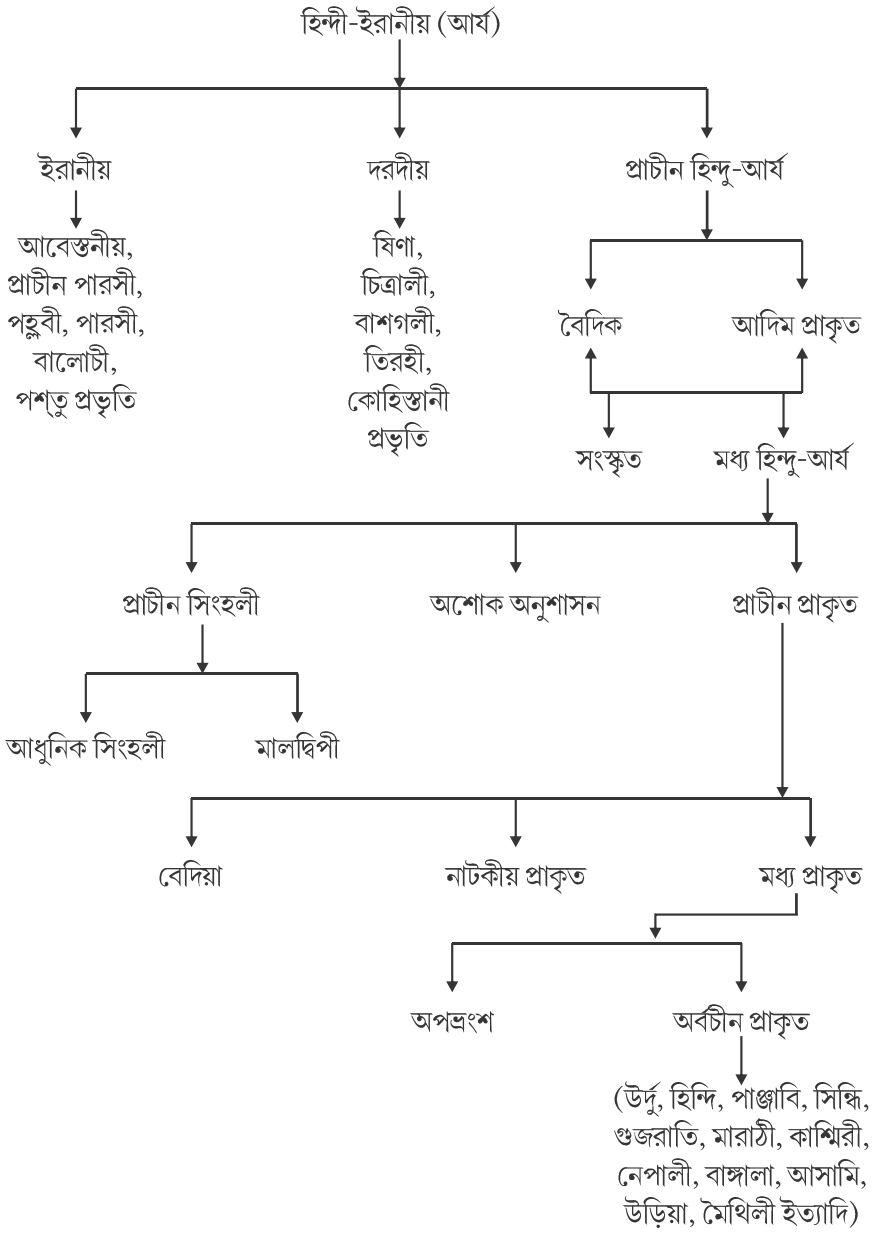

৮.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

মন্তব্য

১। নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণে সুকুমার সেন প্রদত্ত লক্ষণগুলি সম্পর্কে মতামত
বিচার করো।

৩। বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

৮.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

২। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

একক-৯ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষার পরিচয়

বিন্যাস ক্রম

৯.১। প্রাচীন বাংলা ভাষার ভূমিকা

৯.২। প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

৯.৩। মধ্য বাংলা ভাষার ভূমিকা

৯.৪। আদি-মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তন

৯.৫। অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তন

৯.৬। আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

৯.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

৯.৮। সহায়ক গ্রন্থ

৯.১। প্রাচীন বাংলা ভাষার ভূমিকা

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের রচিত চর্যাগীতিগুলিতে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত এই সাধনসঙ্গীতগুলি নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থের 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' অংশ প্রথম প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (The origin and Development of the Bengali Language), ড. সুকুমার সেন (চর্যাগীতি পদাবলী), ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় (Old Bengali Language and Text এবং চর্যাগীতি), ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলা ভাষাপরিক্রমা, ২য় খণ্ড)। চর্যার ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যিক গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (Les Chants Mistique de kanha et saraha), ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত (Obscure Religious Cults,

বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি), ড. সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড), ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড) এবং চর্যার একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি সংস্করণ প্রকাশ করেন ড. নীলরতন সেন (চর্যাগীতিকোষ)। চর্যাগীতি ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর যা নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি খুবই নগণ্য। অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থ 'অমরকোষ'-এর টীকা রচনা করেছিলেন বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ। এছাড়া 'সেকশুভোদয়া'য় সঙ্কলিত যে দুচারটি বিচ্ছিন্ন বাংলা গান পাওয়া যায় সেগুলিকেও প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া আছে বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুণ্ডন'-এ দু-চারটি বাংলা ছড়া ও কবিতা।

৯.২। প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

১। সম যুগ্ম ব্যঞ্জন একক এবং পূর্ববতী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হল। নাসিক্য (ঙ, ঞ; ণ, ম) যুক্ত ব্যঞ্জন পূর্বস্বর দীর্ঘ হল। নাসিক্য ব্যঞ্জন ক্ষীণ হয়ে সানুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন- ধর্ম > ধাম; জন্ম > জাম। অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জন রয়ে গেল। যেমন - দুলক্খ < দুর্লক্ষ্য; মিচ্ছা < মিথ্যা ইত্যাদি।

২। পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় ছিল, তবে অনেক সময় যুক্তস্বর [-ইঅ] ঈ (ই) - কারে পরিণত হল। যেমন ঃ- ভণতি > ভণই; জ্বলিত > জ্বলিঅ।

৩। 'য়'-শ্রুতি তো ছিলই, 'ব'-শ্রুতিও ছিল। যেমন ঃ- নিকটে > নিয়ড্ডি (= নিয়ড়ি); আয়াতি > আবয়ি (= আঅই); নাবেন > নাবেঁ (= নাএ)।

৪। [-এর, -অর, -র] বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হত। যেমন ঃ- ''রখের তেন্তুলি'' (গাছর তেঁতুল); ''ডোম্বী এর সঙ্গে'' (= ডোমনীর সঙ্গে)। এই র-কারান্ত সম্বন্ধপদ যে বিশেষণ সে ধারণা তখনো লুপ্ত হয় নি, তাই যেন বিশেষ্যের অনুযায়ী লিঙ্গ। যেমন ঃ- ''কাহেরি শঙ্কা'' (= কাহার শঙ্কা); ''মেরি বাড়ী'' (আমার বাড়ি)। প্রাচীন সম্বন্ধপদও টিঁকে আছে। যেমন ঃ- সমুদা > সমুদ্দাহ = সমুদ্রস্য ইত্যাদি।

৫। [-ক, -কে, -রে] বিভক্তির দ্বারা গৌণকর্মের ও সম্প্রদানের পদ সিদ্ধ হত। যেমন ঃ- 'নাশক' (নাশের জন্য); ''মতিএ ঠাকুরক পরনিবিত্তা'' (মন্ত্রীর দ্বারা রাজাকে রোধ করা হয়েছে); ''বাহবকে পারই'' (বইতে পারে)।

মন্তব্য

৬। [-ই, -এ, -হি, -তে] -এইগুলি অধিকরণের বিভক্তি। যেমন ঃ- নিয়ড্ড (= নিয়তি > নিকটে); ঘরে (= গৃহকে)।

রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গে মিল থাকায় কখনো কখনো অধিকরণে [-এ] বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন ঃ- ঘরেঁ।

৭। অপাদানের অর্থে অধিকরণের অর্থ নিহিত থাকায় অপাদানের অর্থে অধিকরণের বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন ঃ- ''জামে কাম কি কামে জাম'' (জন্ম হতে বা জন্ম দ্বারা কর্ম, কি কর্ম হতে বা কর্ম দ্বারা জন্ম)।

৮। অপাদানে অপভ্রষ্ট হতে আগত (-ছ) বিভক্তি দুই একটি পদে পাওয়া গেছে। যেমন ঃ- খেপাহ (< ক্ষেপভ্যম্ = ক্ষেপাৎ); রঅণহু (= রত্নাৎ)।

৯। করণের বিশিষ্ট বিভক্তি [-এঁ] সপ্তমীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হওয়ায় করণেও [-তেঁ, -তে, -এতেঁ] বিভক্তি দেখা গেল। যেমন ঃ- সাদেঁ (> শব্দেন); বোহেঁ (< বোধেন) ইত্যাদি।

১০। সংস্কৃতে বহুবচন থেকে আগত 'আম্হে, তুম্হে' পদ দুইটি একবচনেও চলতে শুরু করেছে, যদিও প্রাচীন একবচন 'ইউ' তখনো লোপ পায় নি। উত্তমপুরুষ সম্বন্ধ 'মো (> মম)' পদ কর্তাকারকেও ব্যবহৃত হত। 'মই' (< মরেন); 'তঁই' (< ত্বয়েন) মূলত করণ কারকের পদ। এগুলি তখনো কেবল কর্মভাববাচ্যের কর্তা রূপেই চলত। যেমন ঃ- ''মই দেখিল'' (= ময়া দৃষ্টম্) ইত্যাদি।

১১। কর্তৃব্যতিরিক্ত কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হত। যেমন ঃ- ''তঁই বিনু'' (ত্বয়া বিনা); ''তোহোর অন্তরে'' (তোর তরে); ''অধরাতি ভর কমল বিকসউ'' (অর্ধরাত্রি ভরে অর্থাৎ ধরে কমল বিকশিত হল)।

১২। কর্মভাববাচ্যে ক্রিয়াপদে অতীতকালে [-ইল] এবং ভবিষ্যতকালে [-ইব] বিভক্তি যুক্ত হত। ক্রিয়া সকর্মক হলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হত, অকর্মক হলে প্রথমা বিভক্তি। এই ধরনের ক্রিয়াপদ কর্তৃপদের বিশেষণরূপে গণ্য ছিল। তাই কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়াপদে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন ঃ- ''চলিল কাহ্ন'' (কৃষ্ণঃ চলিতঃ);

''মই বুঝিল'' (ময়া বুদ্ধম্); ''মই ভাইব'' (ময়া ভবিতব্যম্); কিন্তু ''লাগেলি আগি'' (অগ্নিকা লগ্না); ''মই দিবি পিরিচ্ছা'' (ময়া দাতব্যা পুচ্ছা)।

১৩। প্রাচীন ভাব-কর্মবাচ্যে পদের প্রয়োগ চলিত ছিল। যেমন ঃ- ''নাব ন ভেলা দীসই'' < নৌঃ ন ভেলকঃ দৃশ্যতে; ''বাট জাইউ'' < বর্ত্ম সায়তু (যায়তাম্)। ভাববচন পদের সঙ্গে 'যা' ধাতুর পদ দিয়ে যৌগিক কর্মভাববাচ্যের প্রচলন শুরু হয়েছিল। যেমন ঃ- ''ধরণ ন জাই'' < ধরণৎ ন যাতি (ন ধ্রিয়তে); ''কহন ন জাই'' < কহনৎ ন যাতি (ন কথ্যতে)।

১৪। নিষ্ঠা প্রত্যয়ে করণ-অধিকরণের [-এ] বিভক্তি যুক্ত হয়ে এবং ও-প্রত্যয়ান্ত শব্দ শুধুই অথবা স্বার্থিক [আ] যুক্ত হয়ে, অসমাপিকা ক্রিয়াপদে পরিণত হল। যেমন ঃ- ''সাঙ্কমত চড়িলে'' (সাঁকোতে চড়লে); ''চাহন্তে চাহন্তে'' (চাহিতে চাহিতে); ''দৃঢ় করি'' (দৃঢ় করে); ''আঁখি বুঝিঅ'' (আঁখি বুঁজে) ইত্যাদি।

১৫। বাংলা ছাড়া অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না এমন বিশিষ্ট প্রয়োগ চর্যাগীতিগুলিতে প্রচুর মিলেছে। যেমন ঃ- ''থির করি'' (= স্থির করে); ''ভান্তি ন বাসসি'' (ভ্রান্তি বাসিস অর্থাৎ মনে করিস না) ইত্যাদি।

১৬। শব্দসমষ্টি প্রধানত তদ্ভব হলে তৎসম শব্দেরও সন্ধান মেলে। যেমন ঃ- তথাগত, তরুবর, রাজপথ, অজরামর। কিছু কিছু অনার্য শব্দও পাওয়া যায়। যেমন ঃ- ডোম্বী, ঠাকুর প্রভৃতি।

১৭। আদিস্বরে শ্বাসাঘাত পড়লেও অনাদ্য শ্বাসাঘাতও লক্ষণীয়। যেমন ঃ- অবনাগমন < আগমন গমন; অন্ধার < অন্ধকার ইত্যাদি।

১৮। বাংলার বাগ্‌ধারা ও ইডিয়ম চর্যার ভাষায় সুস্পষ্ট। যেমন ঃ- ''গুণিয়া লেহুঁ'' (গুনিয়া লই); ''থির করি'' (স্থির করি) ইত্যাদি।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। প্রাচীন বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কোন্‌টি?

উত্তর ঃ প্রাচীন বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ।

মন্তব্য

২। প্রাচীন বাংলা ভাষার সময়সীমা কত ধরা হয়?

উত্তর ঃ আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

৩। চর্যাপদের সাধনসঙ্গীতগুলি নেপালের রাজদরবার থেকে কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর ঃ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৯.৩। মধ্য বাংলা ভাষার ভূমিকা

সাধারণত মধ্যবাংলার ব্যাপ্তি ধরা হয় ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর সূচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ড. সুকুমার সেন-এর মতে; ''চতুর্দশ শতাব্দে ও পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা বলিয়া নিশ্চিতভাবে নেওয়া যাইতে পারে এমন কোনো রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ অবধি শতাব্দ কালের কতটা প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই।'' ('ভাষার ইতিবৃত্ত')

মধ্য বাংলার দুটি বিভাগ বর্তমান - ক) আদি-মধ্য বাংলা এবং খ) অন্ত্য-মধ্য বাংলা।

৯.৪। আদি-মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তন

বাংলা ভাষার আদি-মধ্যযুগের (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) একমাত্র প্রামাণিক নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি ছাড়া কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধার বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্য এই পর্বের রচনা বলে ধরা হয়। তবে পরবর্তীকালে এগুলির ভাষা পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত হওয়ার ফলে এগুলিকে আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার প্রামাণিক নিদর্শন রূপে গণ্য করা যায় না। তাই শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর উপর নির্ভর করেই এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করা যায়।

১। আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির স্থিতি। যেমন ঃ- বাড়াই > বড়াই; আউলাইল > আইলাইল ইত্যাদি।

২। মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথাব ক্ষীণতা অর্থাৎ 'হ্ন (ন্হ)

> ন' এবং 'ম্হ (ম্হ) > ম'। যেমন ঃ- কাহ্ন > কনে; আম্হি > আমি ইত্যাদি। মন্তব্য

৩। [রা] বিভক্তির যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন পদ সৃষ্টি। যেমন ঃ- আম্হারা, তোম্হারা, তারা।

৪। [-ইল] -অন্ত অতীতের এবং [-ইব] -অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রযোগ। যেমন ঃ- ''মো শুনিলোঁ'' (আমি শুনিলাম); ''মোই করিমোঁ'' (মুই করিবে) ইত্যাদি।

৫। প্রাচীন [-ইঅ-] বিকরণযুক্ত কর্মভাব-বাচ্যের ক্রমশ অপ্রচলন এবং 'যা' ও 'ভূ' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাব-বাচ্যের সমধিক প্রচলন। যেমন ঃ- ''ততেকে সুঝাল গেল মোর মহাদানে''; ''সে কথা কহিল না'' প্রভৃতি।

৬। অসমাপিকার সহিত 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন ঃ- লইছে > লই + (আ) ছে, রহিলছে > রহিল + (আ) ছে (= রহিয়াছে)।

৭। যথাক্রমে বক্তার প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বুঝতে 'গিয়া' ও 'সিয়া' (< আসিয়া); এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদে অনুসর্গরূপে ব্যবহার। যেমন ঃ- দেখ গিয়া > দেখ-গে; দেখ সিয়া > দেখ-সে ইত্যাদি।

৮। ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক- পজ্ঝটিকা থেকে চতুর্দশাগার পয়ারের বিকাশ।

৯। নিষেধসূচক 'না' অব্যয়ের ক্রিয়ার পূর্বে প্রয়োগ। যেমন ঃ- ''না আইসে'' (আসে না); ''না জাইহ'' (যাইও না) ইত্যাদি।

১০। অল্পসংখ্যক আরবি-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ।

৯.৫। অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তন

অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের বাংলা ভাষায় নিদর্শনগুলি হল- বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী, মঙ্গলকাব্য, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা প্রভৃতি।

মন্তব্য ১। অন্ত্যস্বরের লোপ এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা (বা দ্ব্যক্ষরতা) দেখা দিল। এই সূত্রে ধ্বনি পদ্ধতি খানিকটা সরল হল। এই সরলতা নিম্ননির্দিষ্ট ধারায় হয়েছে।

ক) পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অ-কারের লোপ। যেমন- রাম্; বট্‌গাছ্; কিন্তু শক্ত; গোবিন্দ ইত্যাদি।

খ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যস্বরের লোপ। যেমন ঃ- হল্‌দি (< হরিদ্রা), ভাব্‌না, গাম্‌ছা।

গ) 'ই', 'উ' ধ্বনির অপিনিহিত (অথবা বিপর্যাস)। তারপরে অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) উ>ই। এর পর এই ধ্বনির লোপ অথবা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে সন্ধি। তার পরে - একেবারে আধুনিক প্রাক্কালে এই সন্নিবদ্ধ অপিনিহিতি (অথবা বিপর্যস্ত) স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্রুত পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শুধু পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় কথ্যভাষায় (চলিত ভাষায়) দেখা দিয়েছে। এই ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের উদাহরণ ঃ-

- **অপিনিহিতি বা বিপর্যাস ঃ-**

কালি > কাইল; সাধু > সাউধ; ষাঠি > ষাইঠ; চারি > চাইর; মারি > মাইর ইত্যাদি।

- **অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) ধ্বনির লোপ ঃ-**

কালি > কাইল > কাল; রামশালি > রামশাইল > রামশাল; ফল্গু > ফগ্‌গু > ফাগু > ফাউগ > ফাগ; মাগু > মাউগ > মাগ ইত্যাদি।

- **অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) উ > ই, এবং ই ধ্বনির লোপ ঃ-**

ধাতু > ধাউত > ধাইত > ধাত; দদ্রু > দাদু > দাউদ > দাইদ > দাদ; মাসুয়া > মাউসুয়া > মেসো; আকুল > আউল > আইল > এলো (চুল); চাউল > চাইল > চাল।

- **<u>অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) জাত অথবা অন্য দ্বিস্বরের সন্ধি ঃ-</u>** মন্তব্য

করিয়া > কইরা > ক'রা; চাউলের > চাইলের > চালের > চেলের; জাতিএর > জাইতের > জাতের > জেতের।

- **<u>সন্ধির অথবা লোপের পর অতিশ্রুতি ঃ-</u>**

করিয়া > কইরা > ক'রা > ক'র্যা > করে; খাইয়া > খা'য়া > খায়্যা > খেয়ে; পাতিয়া > পাইতা > পাত্যা > পেতে।

২। সাধু ও চলিত ভাষায় ঢ়-কারের এবং 'ন্হ, ম্হ' এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ। যেমন ঃ- বুঢ় > বুড়; আম্হার > আমার; কাহ্ন > কান ইত্যাদি।

৩। পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান লোপ প্রবণতা। যেমন ঃ- ভাত > ভাৎ, দাস > দাস্ ইত্যাদি।

৪। '-ইআ > এ্যা, -এ'; '-উআ > -ও'। যেমন ঃ- বানিয়া > বান্যা > বেনে; সাথুয়া > সেথো; জালিয়া > জাল্যা > জেল্যা > জেল ইত্যাদি। এই পরিবর্তন অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকট হয়ে ওঠে।

৫। বিশেষ্য কর্তার বহুবচনে [-রা] বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে [-গুলা, -গুলি] বিভক্তি, তির্যক কারকের বহুবচনে [-দি, -দিগ] বিভক্তি। [-দিগ-] বিভক্তি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের আগে দেখা যায় নি। এই বিভক্তিগুলি আগে পদ ছিল।

৬। [-ইউ] - অন্ত কর্মভাব-বাচ্যের অনুজ্ঞার লোপ।

৭। [-ইল] এবং [-ইব] অন্ত ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন ঃ- ''মই করিল'' (ময়া কৃতম্) > মই করিলাঙ (অহংকৃতবান্); ''তেঁ করিব'' (তেন কর্তব্যম্) > সে করিবে (সং কর্তব্যঃ)।

৮। 'আছ্' (সং 'অস্') ধাতুর যোগে বহুভাষিত (বা যৌগিক) কালের বহুল প্রয়োগ। যেমন ঃ- আসিছি (আসিতেছি, আসিয়াছি), অসিতেছে, আসিয়াছিল

মন্তব্য ইত্যাদি।

৯। কোনো একটিমাত্র ক্রিয়াপদের পরিবর্তে একাধিক ক্রিয়াপদের (অর্থাৎ অসমাপিকার বা ভাববচনের সাথে 'কৃ' ও অন্য কোনো ধাতুর পদ সহায়ক রূপে ব্যবহার) প্রাচীন সংস্কৃতে দেখা যায়। এই প্রয়োগ অপভ্রষ্ট- অবহট্‌ঠের মধ্যে দিয়ে বাংলায় চলে আসছে। অন্ত্য-মধ্য যুগে সাধুভাষায় এই যৌগিক প্রয়োগ বহু তদ্ভব ধাতুকে সরিয়ে দিয়েছে। যেমন ঃ- 'জিনা' (জিনাতি) অর্থ জয় করা; 'হুনা' (হুনোতি) অর্থ হোম করা; 'বাহুড়া' (ব্যাঘুটয়তি) ও 'নেওটা' (নিবর্ততে) অর্থ ঘুরে বা ফিরে আসা; 'বুলা' অর্থে চলে বেড়ানো; 'পিয়া' (পিবতি) অর্থ পান করা; 'বসা' (বসতি, উপবিশতি) অর্থ বাস করা, 'গোড়া' অর্থে পিছু পিছু যাওয়া, অনুগমন করা ইত্যাদি।

১০। সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতু রূপে ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দের রচনায় বেশ দেখা যায়। অন্ত্য-মধ্য বাংলায়ও এমন প্রয়োগ যথেষ্ট রয়েছে। যেমন ঃ- 'অনুব্রজি' (= অনুগমন করে); 'নমস্করিলা' (নমস্কার করল); 'সান্ত্বাইব' (সান্ত্বনা দেব); 'নিমন্ত্রিয়া'; 'প্রবর্তিতে' ইত্যাদি।

১১। বহুপরিমাণে আরবী-ফারসী (সেইসঙ্গে অল্পস্বল্প তুর্কি) এবং শেষের দিকে কিছু পরিমাণে পোর্তুগিজ শব্দের প্রবেশ।

১২। বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার। অবহট্‌ঠের পরিণামরূপে নেপাল-মোরঙ্গ-বাংলা-উড়িষ্যা-আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলী গানে এই ভাষা চলিত হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে এই কৃত্রিম কাব্যভাষায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকবিতা অজস্র লেখা হয়েছিল। ব্রজবুলির মূলে আছে অবহট্‌ঠ। সেই সঙ্গে প্রাচীন মৈথিলী এবং বাংলা ভাষার বিশিষ্ট পদ এবং প্রয়োগও কিছু কিছু ঢুকে গেছে। আসাম ও বাংলা ছাড়া অন্যত্র ব্রজবুলির চর্চা ফলপ্রসু হয়নি। ব্রজবুলির ছন্দ অবহট্‌ঠ ও মৈথিলীর মতোই মাত্রামূলক।

<u>নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। মধ্য বাংলা ভাষার সময়কাল কত?

উত্তর ঃ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০। মন্তব্য

২। আদি-মদ্য বাংলার প্রধান নিদর্শন কী?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

৩। অন্ত্য-মধ্য বাংলার নিদর্শনগুলি কী কী?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদি।

৯.৬। আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাংলার আধুনিক স্তরের আরম্ভ। এই স্তরের প্রধান লক্ষণগুলি হলো ঃ-

১। লেখবার ভাষা মুখের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সাধুভাষা রূপে সাহিত্যের একমাত্র বাক্‌রীতি হযে দাঁড়ালো। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় শেষ অবধি লেখ্য ভাষায় কথ্য ভাষার পদের মিশ্রণ অবারিত ছিল। এখন আর তা রইল না।

২। পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পদমধ্যবর্তী পাশাপাশি দুই স্বর- অপিনিহিত (বিপর্যস্ত) অথবা মৌলিক - সন্ধিবদ্ধ হল এবং তারপর শেষ স্বরের পরিবর্তন ঘটল। যেমন - করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে; পাইরা > পেয়ে; নাটুয়া > নাউটুয়া > নাইটুয়া > নাটুয়া > নেটো।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে কথ্যভাষায় সাধারণভাবে স্বরসঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন ঃ- জলুয়া (জলবৎ) > জ'লো; পটুয়া > প'টো ইত্যাদি।

৪। আ-কারান্ত কোনো কোনো নিজন্ত ধাতুর রূপ অনিজন্ত হয়ে দাঁড়ালো। যেমন ঃ- পেলা, ফেলা (পৈলায়, ফেলায়') > ফেল (ফেলে) ইত্যাদি।

৫। সাধুভাষায় যুক্তিক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন ঃ- দান করা, পান করা, আহর করা, উপবেশন করা, জিজ্ঞাসা করা, গমন করা ইত্যাদি।

মন্তব্য

৬। ভাববচন শব্দের সঙ্গে 'পূর্বক' অথবা 'করতঃ' যোগ করে [-ইয়া] -অন্ত অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার। যেমন ঃ- গমন-পূর্বক; গমন করতঃ (গিয়া); শ্রবণ পূর্বক; শ্রবণ করতঃ (শুনিয়া)।

৭। ফারসী 'ব' (Wa)-জাত অব্যয় 'ও' শব্দের পদের ও বাক্যের সংযোজক রূপে ব্যবহার। যেমন ঃ- 'রাম ও শ্যাম'; 'সে সেখানে গেল ও দেখল'। সংস্কৃত 'অপি' (এবং 'হ') জাত 'ও' সংগ্রাহক অনুসর্গ রূপে পূর্বাপর প্রচলিত ছিল।

৮। নঞর্থ 'ন' শব্দের সমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' বসিয়ে পরে বসা। যেমন ঃ- ম-ব ''না জাইহ'' > আ-বা ''যাইও না''; ম-ব ''না শুনে'' > আ-বা ''শোনে না''। তবে সম্ভাবক ভাবে পূর্বপ্রয়োগ হয়। যেমন ঃ- ''সে না খায় না খাবে।''

৯। সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ। যেমন ঃ- সে সেখানে গেল। সে দেখল। সে অবাক হল। এই তিনটি বাক্যের বদলে- ''সে সেখানে গিয়ে দেখে অবাক হল''।

১০। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচুর ফারসী (ও আরবী) শব্দ গৃহীত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় দশক থেকে তা কমতে শুরু হল এবং ইংরেজি শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাংলায় এসেছিল সেগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে চেনা যায় না। যেমন ঃ- আপিল, লাট, কার, লম্প, লণ্ঠন, বেঞ্চি, সমন ইত্যাদি।

১১। গদ্যরীতির প্রচলন হল এবং গদ্যের পসার পদ্যকে ম্লান করল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে দিগন্তের ও দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটল।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। আধুনিক বাংলার সময়কাল কবে থেকে শুরু হল?

উত্তর ঃ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

২। আধুনিক বাংলায় প্রথম কীসের প্রচলন হল?

উত্তর ঃ আধুনিক বাংলায় প্রথম গদ্যরীতির প্রচলন হল। মন্তব্য

৯.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২। অন্ত্য-মধ্য বাংলা বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩। আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝ?

৯.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

একক-১০ বাংলা উপভাষার স্তরবিভাজন ও বাংলা শব্দভাণ্ডার

বিন্যাস ক্রম

১০.১। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা ও শ্রেণীবিভাগ

১০.২। উদাহরণসহ আঞ্চলিক উপভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য

১০.৩। বাংলা শব্দভাণ্ডার

১০.৪। রাজ্য পরিচালনা বিষয়ক মুসলমান সংস্কৃতি-বিষয়ক শব্দ

১০.৫। বিদেশী ইউরোপীয় থেকে বিভিন্ন শব্দ

১০.৬। দেশী গৃহীত শব্দ

১০.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১০.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১০.১। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা ও শ্রেণীবিভাগ

কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অঞ্চল বিশেষে ব্যবহৃত ভাষার নাম উপভাষা। ভাষা-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক হলে এবং বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পর্যন্ত একই ভাষার কথ্যরূপটি যথাযথভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে সীমিত গণ্ডির মধ্যে গোষ্ঠীগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ভাষায় প্রবেশ করে — তখনই সৃষ্টি হয় উপভাষার।

পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষারই রয়েছে নানা আঞ্চলিক উপভাষা। বাংলা ভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষারও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে।

বাংলার প্রধান পাঁচটি উপভাষা ও সেগুলির অবস্থান মোটামুটি এইরকম ঃ-

উপভাষা	অবস্থান	মন্তব্য
১। রাঢ়ী	মধ্য পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী- বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী- কলকাতা, চব্বিশ পরগণা,নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।	
২। বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম)।	
৩। ররেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।	
৪। ঝাড়খণ্ডী	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মালভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর)।	
৫। কামরূপী বা রাজবংশী	উত্তর-পূর্ববঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।	

১০.২। উদাহরণসহ আঞ্চলিক উপভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য

১। **রাঢ় অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-**

ক) অ-কারের ও-কার রূপে উচ্চারণ প্রবণতা- অ>ও। যেমন- মধু>মোধু; অতুল>ওতুল; বন>বোন।

খ) অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির ফলে ধ্বনি পরবির্তন। যেমন- রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে; বানিয়া>বাইন্যা>বেনে; দেশি>দিশি; বিলাতি>বিলিতি;

মন্তব্য আইল>এল; করিয়া>করে।

গ) আনুনাসিক স্বরধ্বনি পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত। যেমন- কাঁটা, আঁট, চাঁদ, বাঁধ। সময় সময় স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্তও মেলে - খোঁকা, হাঁসি, পুঁথি। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের বিভাষায় অনুনাসিকের অবস্থানে আগম প্রচুর লক্ষিত হয়। যেমন - বাঁকুড়া - মানভূম - বীরভূমে - 'হঁইছে', 'চাঁ'।

ঘ) অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণে পদের আদিতে র-কারের আগমন ও লোপ হয়। যেমন - আশু>রাশু; ওঝা>রোজা; রস>অস।

ঙ) শব্দের আদিতে সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ যথাযথ উচ্চারিত হয়; কিন্তু শব্দের আগিদ অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ পদান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতার লোপ ঘটে। যেমন - দুধ>দুদ্; মধু>মদু; ইং লর্ড>লাড>লাট।

চ) কখনো কখনো পদান্ত অঘোষ ধ্বনির ঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তর। যেমন - শাক>শাগ; কাক>কাগ; ফারসী গলৎ>গলদ।

ছ) শব্দরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- তির্যক কারকের বহুবচনে ''দের''; গৌণকর্ম-সম্প্রদানে ''এক'' এবং অধিকরণে ''-তে'' বিভক্তির প্রয়োগ।

জ) ক্রিয়াপদে বিশেষত্ব- ১) সামান্য অতীতে, প্রথম পুরুষে অকর্মক ক্রিয়াপদে [-ল] বিভক্তি (যেমন- সে গেল; সে দিলে);

২) [-লুম্] -নু [-লম্] বিভক্তি দিয়ে উত্তমপুরুষের পদগঠন (যেমন- করলুম>কর্নু এবং করলাম);

৩) যৌগিক ক্রিয়াপদে [-ই] অন্ত অসমাপিকা দিয়ে অসম্পন্ন কালের এবং [-ইযা] -অন্ত অসমাপিকা দিয়ে সম্পন্ন কালের পদ গঠন (যেমন- করিয়াছে>করেছে; করিছিলি>করছিল; করিয়ছে>ক'রেছে; করিয়াছিল>ক'রেছিল)।

ঝ) সাধারণ লোকের উচ্চারণে ল>ন হয়। যেমন- লুচি>নুচি; লেবু>নেবু।

ঞ) চব্বিশ পরগণার অঞ্চল বিশেষে শ>স রূপে উচ্চারিত হয়। কলকাতায় অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণেও এই রীতি দেখা যায়। যেমন- আশু>আসু; শশী>সসী। আবার চব্বিশ পরগণার অঞ্চল বিশেষে অশিক্ষিত লোকের ভাষায় সম্ভ্রম সূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন - ''কথাটা হইতেছে যে ...''। মন্তব্য

ট) বাক্যের বা শব্দের আদিস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষনীয়।

২। **ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-**

ক) ঝাড়খণ্ড বা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষায় আনুনাসিক ধ্বনির প্রাচুর্য। যেমন- চাঁ, হঁইছে, গধাঁচ্ছে ইত্যাদি।

খ) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারক - ''ঘাসকে গেল্‌ছে', ''বাড়ীকে বিদায় হইল পবন কুঙর''; ''বেলা যে পড়ে এল জলকে চল''। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এও অনুরূপে প্রয়োগ লক্ষণীয়- ''পাণিকে আইস''।

গ) নামধাতুর বহুল প্রয়াগ- ''পুখুরের জলটা গঁধাচ্ছে'', ''আজ রাতকে ভারি জাড়াবে''।

ঘ) দণ্ডভুক্তীয় স্তবকের উপভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ হল যুক্ত ক্রিয়াপদের 'আছ' ধাতুর স্থানে 'বট' ধাতুর ব্যবহার ('করিব্‌টে'=করছে)।

ঙ) ক্রিয়াপদে সার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার- যাবেক, কর্‌বেন, বল্‌লেক।

৩। **বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-**

ক) স্বরধ্বনি রাঢ়ীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। সানুনাসিক স্বরধ্বনিও বজায় আছে।

খ) পদের আদিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ বজায় আছে।

গ) সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়লেও অনাদ্য শ্বাসাঘাত সময় সময় লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নেই।

ঘ) পূর্ববঙ্গের উপভাষার প্রভাবে 'জ'-ধ্বনি কখনো কখনো জ্‌(Z) রূপে

মন্তব্য উচ্চারিত হয়। যেমন- 'হয় হয় Zানতি পার না'।

ঙ) শব্দের আদিতে 'র'-কারের আগম ও লোপ এই অঞ্চলের উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন- আশু>রাশু; রস>অস; আমের রস>রামের অস; রামবাবু>আমবাবু ইত্যাদি।

চ) শব্দ ও ধাতুরূপে বরেন্দ্রী মোটামুটি রাঢ়ীরই মতো, তবে অধিকরণে কামরূপী - সুলভ [-ত] বিভক্তিও দেখা যায়; এবং অতীতকালে উত্তমপুরুষে [-লাম] বিভক্তি হয়।

ছ) রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী মূলত একই উপভাষা ছিল। পরে একদিকে বঙ্গালীর অপর দিকে বিহারীর প্রভাব পড়ে রাঢ়ী থেকে বরেন্দ্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

৪। **বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-**

বঙ্গালী বা পূর্ব অঞ্চলের উপভাষার দুইটি বিভাগ রয়েছে।

ক) পূর্ববঙ্গের উপভাষা- মহেশ্বরদি পরগণা ব্যতীত সমগ্র ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, দক্ষিণ-পূর্ব চব্বিশ পরগণার অংশ বিশেষ, খুলনা ও যশোহর জেলা সমূহের উপভাষা ও বিভাষাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা।

ক) **পূর্ববঙ্গের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-**

ক) বিপর্যস্ত বা অপিনিহিত স্বর রক্ষিত আছে। যেমন- রাখিয়া>রাইখ্যা; করিয়া>কইরিয়া> কইর‍্যা; কান্দিয়া>কাইন্দা।

খ) য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন অপিনিহিতির সমরূপ ই-কারের আগম হয়। যেমন- সত্য>শইত্য; কাব্য>কাইব্ব।

গ) আনুনাসিক স্বরধ্বনি রক্ষিত হয় নি। অর্ধ-আনুনাসিক ধ্বনি বজায় আছে- চন্দ্র>চান্দ।

ঘ) অর্ধসংবৃত ''এ'' (e) ধ্বনি অর্ধবিকৃত 'এ' (অ্যা) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত

হয়। যেমন- শেষ>শ্যাষ্; এবং>এ্যাবং। মন্তব্য

ঙ) সাধারণত রাঢ় অঞ্চলের মতোই শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে; তবে রাঢ়ীর মতো তা প্রবল নয়। সময় সময় অনাদ্য শ্বাসাঘাতও লক্ষ্য করা যায়।

চ) সঘোষ মহাপ্রাণবর্ণ মহাপ্রাণতা পরিত্যাগ করে কণ্ঠনালীর স্পর্শযুক্ত তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়েছে। যেমন- ঘর>গর; ধান>দান; ভয়>বয় ইত্যাদি।

ছ) তালব্য বর্ণ দন্ত- তালব্য ঘৃষ্টবর্ণে উচ্চারিত হয়- চ>ৎস; ছ>স; জ>জ্ (Z)।

জ) ড়, ঢ়>র হয়- বাড়ি>বারি; দৃঢ়>দৃর।

ঝ) পদমধ্যস্থিত অঘোষ বর্ণ সঘোষ বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- দিকে>দিগে; ছোট>ছুড্ডু; কে-টা>কেডা ইত্যাদি।

ঞ) শ, ষ, স > হ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- সে>হে; শালা>হালা; সকল>হগল।

ট) পদের আদিতে কিংবা মধ্যস্থিত হ-কার অ-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- হয়>অয়; হইবে>অইবে।

ঠ) শব্দরূপে কর্তায় ''-এ'', গৌনকর্ম-সম্প্রদানে ''-রে'', আধকরণে '-ত', '-তে' ও তির্যক কারকে '-রা', '-গো' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন- বাপে করছে; মায়ে ডাকে; (-বাড়ীতে) গেছে; আমরাকে; আমরার, আমাগোর, তাগোর।

ড) ক্রিয়াপদের গঠন প্রণালীতে রাঢ়ী-বরেন্দ্রী থেকে অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। ভবিষ্যত অর্থে নিত্যবৃত্ত কালের প্রয়োগ। যেমন- 'হে যাইত না' (সে যাইবে না); ভবিষ্যত অর্থে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে ''উম্, মূ'' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- আমি খেলুম্ (খেলিব); 'করমু' (করিব)।

ঘটমান অর্থে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগ। যেমন- কাকায় ডাকে (কাক ডাকছে)। অতীত কালের উত্তম পুরুষে 'লাম্' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন- খাইলাম (খেলাম); করলাম ইত্যাদি।

মন্তব্য

ঢ) যৌগিক ক্রিয়াপদে '-ই' অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন কালের এবং '-ইতে' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা অসম্পন্ন কালের পদ গঠন। যেমন- করছি; করিতে + আছি > কইর্ত্যাছি (করছি)।

ণ) যশোহর-খুলনার বিভাষায় তুমর্থে 'তে'-এর পরিবর্তে 'তি' প্রত্যয় হয়। যেমন- যাতি > যেতে; শুতি > শুতে।

খ) **দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-**

ক) 'উ' কখনো কখনো 'ও' হয়। যেমন- সুন্দর > সোন্দর।

খ) আনুনাসিক ধ্বনির ছড়াছড়ি। যেমন- আমি > আঁই; আকাশ > আঁশ। স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্তও মেলে। যেমন- কুকুর > কুঁউর; শিকড় > হিঁওর; টাকা > টেঁআ।

গ) শব্দের আদিতে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন 'ক', 'প', জিহ্বামূলীয় উপধ্মানীয় উষ্মবর্ণ 'খ' (x) ও 'ফ' (f) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- কালীপূজা > খালী ফুজা (xalifudza)। ফোঁইর < পুকুর; ফোতলা < পুতুল, আবার কখনো কখনো স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন উষ্মবর্ণ 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- পানি > ফানি > হানি; প্রাণ > ফরাণ > হরাণ ইত্যাদি।

ঘ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মতো শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়। যেমন- আকাশ > আঁশ; কুকুর > কুঁউর; শিকড় > ছিঁওর; নকুল > নেউল; একত্র > অঅত্তর; সকল > হঅল; সুপারি > সুআরি।

৫। **কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-**

ক) ও > উ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- ছোট > ছুডু; ভোর > বুর; চোর > চুর; সোনালী > সুনালী। শ্রীকৃষ্ণকীতনে পাই গোয়ালী > গুয়ালি।

খ) শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদিতে 'অ' কখনো কখনো 'আ' হয়। যেমন- অম্বল > আম্বল; অষ্ট > আষ্ট; লম্বা > লাম্বা; অবস্থা > আবস্থা; অলস > আইল্সা; অকথা > আকথা; লতাপাতা > লাতাপাতা ইত্যাদি।

গ) পদান্তস্থিত অ > ও হয়। যেমন- হইত > অইতো; বাসিত > বইতো। মন্তব্য

ঘ) শব্দের আদিস্থিত 'অ' কখনো কখনো 'উ' হয়। যেমন- বক্ষ > বুক্কা; নকল > লুলুক।

ঙ) শব্দের আদিতে 'অ' কখনো কখনো 'এ' হয়। যেমন- খড় > খের; লণ্ঠন > লেনটন।

চ) শব্দের আদিস্থিত 'এ' কখনো 'অ' কিংবা 'আ' হয়। যেমন- এখন > অখন; এতগুলি > অতলি; এতক্ষণ > অতক্খন।

ছ) শব্দমধ্যস্থিত 'অ' কখনো কখনো 'উ' হয়। যেমন- বাসন > বাসুন; এমন > এমুন; আসন > আসুন।

জ) অন্ত 'অ' অনেকসময় 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- তুচ্ছ > তুচ্ছু; শুদ্ধ > শুদ্ধ > শুদ্দু; দুঃখ > দুক্খু।

ঝ) শব্দমধ্যস্থিত 'প' উষ্মধ্বনি 'ফ' (f) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- আপদ > আফদ; আপনার > আফনার। সময় সময় প > ব হয় - সুপারি > সুবারি।

কাছাড় জেলার ভাষার সঙ্গে নোয়াখালী - চট্টগ্রামের ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষা কীকী ?

উঃ রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী এবং কামরূপী বা রাজবংশী।

২। কোন্ দুটি উপভাষা প্রায় অভিন্ন বলা যেতে পারে?

উঃ রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রী।

৩। বরেন্দ্রী উপভাষা কোথায় ব্যবহৃত হয়?

উঃ উত্তরবঙ্গে মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা।

মন্তব্য

৪। রাঢ়ী উপভাষার প্রচলন কোথায় রয়েছে?

উঃ মধ্য পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী- বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী- কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।

১০.৩। বাংলা শব্দভাণ্ডার

ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দভাণ্ডার। প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও গ্রীক নতুন শব্দনির্মাণ শক্তিতে অতুলনীয়। আধুনিক ভাষার মধ্যে ইংরেজি বিদেশি শব্দ আত্মসাৎ করণ শক্তিতে অপরাজিত।

যেসকল বস্তু বা প্রাণী আর্যেরা ভারতবর্ষে এসে নতুন দেখল সেগুলির নাম অনার্যের ভাষা থেকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। যেমন- কদলী, তাম্বুল, ময়ূর, কালক্রমে অনেক পরিচিত বস্তুর অনার্য নামও আর্যভাষায় গৃহীত হয়েছিল। যেমন- মীন, তোয়, কম্বল।

বাংলা ভাষায় শব্দগুলিকে মুখ্যত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-- ১) মৌলিক, ২) দেশী বা দেশজ, ৩) বিদেশী এবং ৪) মিশ্র।

মৌলিক শব্দগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়- ক) তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, খ) তৎসম, গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি মূলধন তদ্ভব। তার মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় অন্য শাখার শব্দও আছে; অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, চীনীয় ইত্যাদি থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দও আছে।

-ঃ বাংলা ভাষার শব্দাবলীর উদ্ভবগত শ্রেণীভেদ ঃ-

মন্তব্য

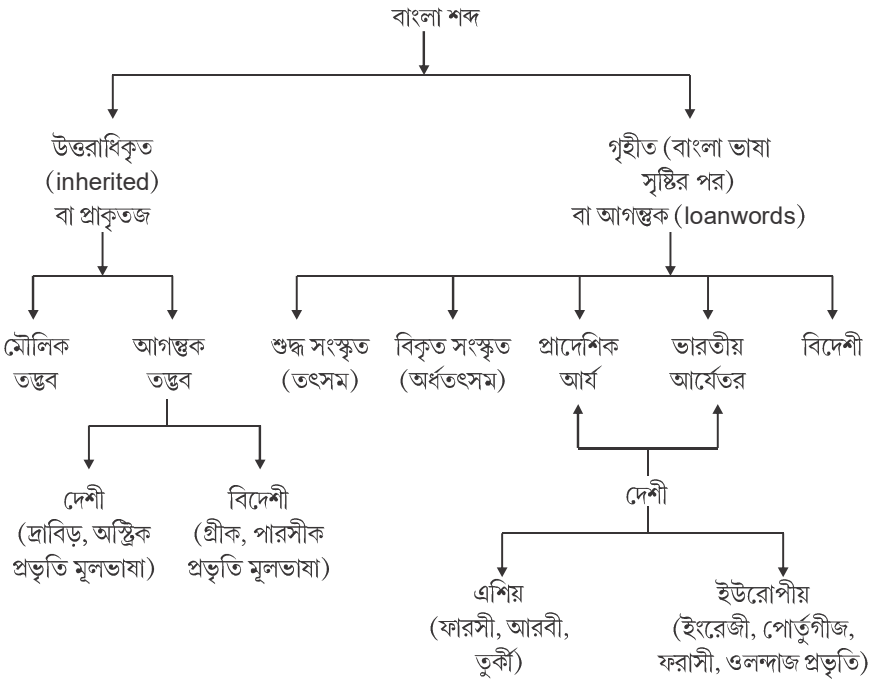

তৎসম বা গৃহীত শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ

যে সব শব্দ আধুনিক বাংলার সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত ভাবে গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় তৎসম। 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃতের 'সম' অর্থাৎ অভিন্নমূর্তি। যেমন- জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী-পুরুষ, সূর্য ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম, ভগ্নতৎসম বা বিকৃততৎসম শব্দ

যে সকল সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণে কালক্রমে বিকৃতি লাভ করেছে, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকরা তাদের Semi-tatsama বলেছেন। অর্ধতৎসম শব্দগুলির বিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

তৎসম	অর্ধতৎসম	
শ্রী	ছিরি	[শ > ছ ও স্বরভক্তি]
শ্রদ্ধা	ছেদ্দা	[র > এর]
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ	[র > এর্]
প্রসাদ	পেসাদ	[র > এ (র্)]

মন্তব্য

গৃহিণী	গিন্নী	[ঋ > ঈর্]
রাত্রি	রাত্তির	[রি > ইর্]
মন্ত্র	মন্তর	[অ > অর্]
পুত্র	পুত্তুর	[অ > উর্]
অবশ্য	অবিশ্যি	[য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে-ই]
পথ্য	পথ্যি	[য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে-ই]
সূর্য	সুজ্জি	[য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে-ই এবং সমীভবন]
স্বাদ	সোয়াদ	[বিস্ফারণ]
ক্ষুধা	খিদে	[স্বরসংগতি]
কবিরাজ	কোবরেজ	[স্বরসংগতি]
বৎসর	বচ্ছর, বছর	[সমীভবন]
মহোৎসব	মোচ্ছব	[সমীভবন ও হ-লোপ]
বৃহস্পতি	বেস্পতি	[হ-লোপ ও ঋ > এ]
মহার্ঘ্য	মাগ্‌গি	[হ-লোপ ও য-যুক্ত ব্যঞ্জনের ই-তে পরিণতি, সমীভবন]

কবিতায় অনেক সময় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাদের প্রধানত স্বরভক্তিই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন-

স্পর্শ > পরশ; প্রীতি > পিরীতি; যত্ন > যতন।

এগুলি ছাড়া অর্ধতৎসম শব্দের আরো কয়েকটি উদাহরণ হল ঃ- কৃষ্ণ > কেষ্ট (কানু); চিত্র > চিত্তির (চিতা); বৈদ্য > বদ্দি (বেজ); জ্যোৎস্না > ছোছনা (জোনা-কি); রক্ত > রকত (রাতা)।

বাংলায় তৎসম শব্দের একান্ত অভাবের কারণ

সংস্কৃত ধ্বনির উচ্চারণ বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ থেকে কতকাংশে স্বতন্ত্র। তাই বাংলার

তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃতের মতো উচ্চারিত হয় না। মন্তব্য

অন্ত্য /অ/ স্বরের উচ্চারণ লোপ, এবং /অ/-এর সম্পূর্ণ ভিন্ন উচ্চারণ, কখনো স্বরসংগতির জন্য /অ/ -এর /ও/-তে পরিণতি, বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার, /এ/-এর এবং য-যুক্ত /অ//আ/-এর /অ্যা/ রূপে উচ্চারণ, /ঋ/ /ন/-এর উচ্চারণের পরিবর্তন, /চ, ছ, জ, ঝ/-এর সৃষ্ট উচ্চারণ, /এত/ /ণ/-এর /ন/রূপে ও /স, শ, ষ/-এর প্রধানত /শ/ রূপে উচ্চারণ, শব্দের মধ্যে ও অন্তে /ড/ /ঢ/ এর /ড়/ /ঢ়/ রূপে উচ্চারণ, যুক্ত ব্যঞ্জনের ভিন্ন উচ্চারণ, স্বরসংগতি এবং দ্বিমাত্রিকতা প্রভৃতি কোনো না কোনো কারণে বাংলায় তৎসম শব্দগুলি উচ্চারণের দিক দিয়ে সবই বিকৃত বা অর্ধতৎসম বলা যায়, অর্থাৎ বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই চলে।

তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ

যে শব্দ আদি ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয়-আর্যের ভিতর দিয়ে ধারাবাহিক পরিবর্তন পেয়ে বাংলা রূপ নিয়েছে, সেগুলি তদ্ভব। তৎ অর্থাৎ মূল স্থানীয় ভাষা ''সংস্কৃত'' থেকে যার 'ভব' অর্থাৎ রীতিমতো উৎপত্তি। বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি মূলধন তদ্ভব।

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তদ্ভব ঃ-

বা আড়াই < প্রা অড্ঢতইঅ < অর্ধতৃতীয়; আইসে < আবিসই < আবিশতি; ইঁদারা < ইন্দাআর < ইন্দ্রগার; এগার < এগ্গারাহ < একাদশ; ওঝা < উবজ্ঝঅ < উপাধ্যায়;কনুই < কহোণিআ < কফোণিকা; খাজা < খজ্জ < খাদ্য; নাতি < নাতিঅ < নপ্তৃক; রানী < রন্নিআ < রাজ্ঞিকা; ষোল < সোলহ < ষোড়শ।

খ) দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব ঃ-

বা ইঁচলা (মাছ) < প্রা ইঞ্চঅ < সং ইঞ্চক < তামিল ইরবু; বা উলু (খড়) < প্রা উলুঅ < সং উলুপ < তামিল উলবৈ; বা খাল < প্রা খল্ল < সং খল্ল < অমিল খাল; বা ঘড়া < সং ঘট < তামিল মলয়ালী কুটম, কানাড়ী কোড়; বা পিলে (ছেলে পিলে) < প্রা পিল্লিঅ, পিলুঅ < সং পিল্লিক < তামিল পিল্লৈ (শাবক);

বা মোট (= বোঝা) < প্রা মুডঅ < সং মুকুট < তামিল মুটে।

মন্তব্য

গ) অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব ঃ-

বা ঢাকা < প্রা, সং ঢক্ক; প্রা বা দুলি < প্রা সং দুলি (কচুপ); টঙ্গ < প্রা সং টঙ্ক (উচ্চস্থান); প্রা বা তাঁবোলা < সং তাম্বুল। এই ধরনের অনেক শব্দের সন্ধান সংস্কৃতে মেলে না। সেগলি অজ্ঞাতমূল। যেমন-উচ্ছে, ঝিঙ্গা, খোকা-খুকি, ডেঙ্গর (উৎকুণ), চেঙ্গা।

ঘ) ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব ঃ-

বা দাম < প্রা দম্ম < সং দ্রম্য < গ্রীক দ্রাখ্মে (মুদ্রা বিশেষ); বা সিমুই < প্রা, সং সমিতা < গ্রীক সেমিদালিস (ময়দা); মুদ্রা < প্রা মুদ্দ < সং মুদ্র (শীলমোহর) < প্রাচীন পারসিক মুদ্রায়।

ঙ) মোগল গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব ঃ-

বা ঠাকুর < প্রা, সৎ ঠক্কুর < তিগির; বা তুরুক (সওয়ার) < প্রা, তুরুক্ক < তুর্কী, তুর্ক।

১০.৪। রাজ্য পরিচালনা বিষয়ক মুসলমান সংস্কৃতি-বিষয়ক শব্দ

বাংলা শব্দভাণ্ডারে আরবি-ফারসী শব্দই বেশী গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে।

আমীর, ওমরাহ, উজীর, নবাব, বাদশাহ্, মালিক, হুজুর, আমিন, ফৌজদার, সরদার, জমাদার, জমা, জমী (জমিন), পিয়াদা (পিয়াদহ), সরকার, আইন, আদালত (অদালৎ), উকীল, দলিল, দস্তাবেজ, নাবালক (নাবালীগ), মকদ্দমা, ফরিয়াদী, খাজনা, গোমস্তা, হাকিম, কায়দা (কাইদহ), কামান, কেল্লা (কিলাহ্), চাকর, চাদর, জাহাজ, জানোয়ার (জানব্বার), খোরাক (খুরাক), দম, দরকার, দোকান (দুকান) নগদ, নেশা (নশহ্), জহরৎ (জওয়াহিরৎ), দহরম্ মহরম (দরহম বরহম), ওয়াকিবহাল, ইয়ার, মজলিস, ইজ্জৎ, সেতার, তরজমা (তর্জুমহ), সাদা, সাফ, সহর, মহল, হাজার, হুঁকা (হুকা), খানসামা, কোর্মা, কিশমিশ, পোলাও, মালাই, কসাই, খাসী, মজুর (মজদুর), খদ্দের

(খরীর্দার), কাগজ, খাতা, গোলাপ (গুল্আব), বাগিচা, জর্দা, ময়দা, মলম, জামা, শাল, মশলা, মিছরি প্রভৃতি। মন্তব্য

মুসলমান ধর্মীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে- আল্লা, খোদা (খু.দা.), মিয়া, মোল্লা, বিসমিল্লা, কোরাণ, নামাজ, ইসলাম, পীর, পয়গম্বর, শির্নী, শহীদ, জবাই (জব্হঃ), জাহান্নম, কবর, নমাজ, নিকা (নিকাহঃ) প্রভৃতি।

কতকগুলি জাতির নাম বাংলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলি ফারসী মারফৎ এসেছে- ইংরেজ, বিলাতী (বিলায়েৎ-ঈ), ইহুদী (য়াহুদী), আরমানী, তিব্বতী, হাবশী প্রভৃতি।

মোগল সম্রাটেরা মূলত তুর্কী ভাষাভাষী হলেও তুর্কীর চেয়ে আরবী ফারসী ভাষারই বেশি সমাদর করতেন। সেজন্য তুর্কী শব্দ বাংলায় এসেছে ফারসীর দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে। যেমন- উর্দু (ওর্দূ), উজবুক (বাং) < উজবক (ফা.) < যোজবেক (তুর্কী), তক্মা (তক্মা), মুচলেকা (মুচল্কা), বাবুর্চি (বওয়রচী) প্রভৃতি।

গর, ফি, বে, হর প্রভৃতি উপসর্গ ও ঈ, খানা, খোর, গিরি, দান, দার, নবিশ, বাজ প্রভৃতি কয়েকটি প্রত্যয়ও ফারসী ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে।

১০.৫। বিদেশী ইউরোপীয় থেকে বিভিন্ন শব্দ

বিদেশী ইউরোপীয় - পোর্তুগিজ ঃ-

পোর্তুগিজরা বাণিজ্য করতে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি জায়গায় যেসব বাংলা ভাষার প্রয়োগ দেখিয়েছে তা তাদের নতুন সংস্কৃতির শব্দ। যেমন ঃ- আনারস (anaras), আলকাতরা (alcatra), আলপিন (alfinete), আলমারি (armario), কাপ (couve), কামিজ (camisa), কেরানি (carrance), গরাদ (grade), গীর্জা (igreja), চাবি (chave), জানালা (janela), নীলাম (leilao), পেয়ারা (pera), পেরেক (prego), বোতাম (botao), মিস্ত্রি (mestre), সাবান (sabao), বেহালা (viola) প্রভৃতি

বিদেশী ইউরোপীয় - ওলন্দাজ ঃ-

ওলন্দাজ ভাষা থেকে তাস খেলার শব্দই এসেছে দেখা যায়। যেমন- হরতন

মন্তব্য (hartan), রুইতন (ruitan), ইস্কাবন (schopen), তুরূপ (teroef)।

বিদেশী ইউরোপীয় - ফরাসী ঃ-

ফরাসী ভাষা থেকে যেসকল শব্দ বাংলায় এসেছে সেগুলি ফরাসী সংস্কৃতির শব্দ। যেমন- কার্তুজ (cartouche), কুপন (coupon), কাফে (cafe), রেস্তোরাঁ (restaurant), ম্যাটিনি (matinee), বুর্জোয়া (bourgeois) প্রভৃতি।

বিদেশী ইউরোপীয় - ইংরেজী ঃ-

ফরাসী, জার্মানী, রুশ প্রভৃতি বহু বিদেশী শব্দ অনেক সময় ইংরেজির মারফৎ বাংলায় এসেছে। যেমন- এসেন্স, কফি, কেক, কাপ, ডিস, প্লেট, কার্পেট, টেবিল (table), বেঞ্চি (bench), চেয়ার, ট্রে, হ্যারিকেন, ল্যাম্প, লাইট, বাস, ট্রেন, মোটর, সাইকেল (cycle), ট্যাক্সি, স্টীমার, ডাক্তার (doctor), ক্লাস, স্কুল, ম্যাপ, বোর্ড, শেলেট (slate), লেকচার, ডক, ডিপো, পাইপ, সিনেমা, থিয়েটার, সীন, নভেল, ব্যাটবল, হকি, নেট, পেট্রোল, কেরোসিন, রেলিং, হারমোনিয়াম, হাসপাতাল, বেড প্রভৃতি।

(শাসন শংক্রান্ত শব্দ)- আপিস, অর্ডার, পিওন, আর্দালী (orderly), নোটিশ, উইল, ওয়ারেন্ট, গভর্নমেন্ট, কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ফর্ম, গেজেট, ডাইরী, নোট, টাইপ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, শমন (summons) প্রভৃতি।

অন্যান্য বিদেশী শব্দের মধ্যে

১। ফরাসী — (উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে)।

২। জার্মান — নাৎসী।

৩। রুশ — স্পুটনিক, ভদ্‌কা।

৪। ইতালীয় — ফাসিস্ত বা ফ্যাসিস্ট, ম্যাজেন্টা।

৫। দক্ষিণ আফ্রিকা — জেব্রা।

৬। অস্ট্রেলিয়া — ক্যাঙারু।

৭। পেরু — কুইনাইন। মন্তব্য

৮। মেস্কিকো — চকোলেট।

৯। চীনা — চা, লিচু।

১০। জাপানী — রিক্স, জুজুৎসু।

১১। মালয়ী — গুদাম।

১২। বর্মী — লুঙ্গী, প্যাগোডা।

১৩। তিব্বতী — লামা।

১০.৬। দেশী গৃহীত শব্দ

আর্যেতর - দ্রাবিড় ঃ-

(তামিল, তেলুগু) আকালি, (গোণ্ডী) আকাল (অর্থ-ক্ষুধা)- বাংলায়) আকাল 'দুর্ভিক্ষ'।

(তামিল) গোন্দু - (বাংলায়) গঁদ।

(তামিল) পিল্লৈ), (তেলুগু) পিল্‌লা - (বাংলায়) (ছেলে +) পিলে।

(তামিল) শুরুট্টু - (বাংলায়) চুরুট।

আর্যেতর - অস্ট্রিক ঃ-

(সাঁওতাল) খোকা, হাঁড়িয়া, গুড়, বঁড়শী (বাড়সি), এছাড়াও রয়েছে - কুড়ি, ডিম, ঝাঁটা, ঝোল, ডাব, ডাঁসা, ডোঙ্গা, ঢাল, ঢেউ, ঢোল।

আর্য - প্রাদেশিক ঃ-

মারাঠী থেকে - বর্গী (বারগীর)।

হিন্দী থেকে - বানী 'অলঙ্কার তৈরির পারিশ্রমিক' (বন্ + আঈ), মিঠাই 'এক প্রকারের মিষ্টান্ন', কচুরি (কচৌরী)।

মন্তব্য

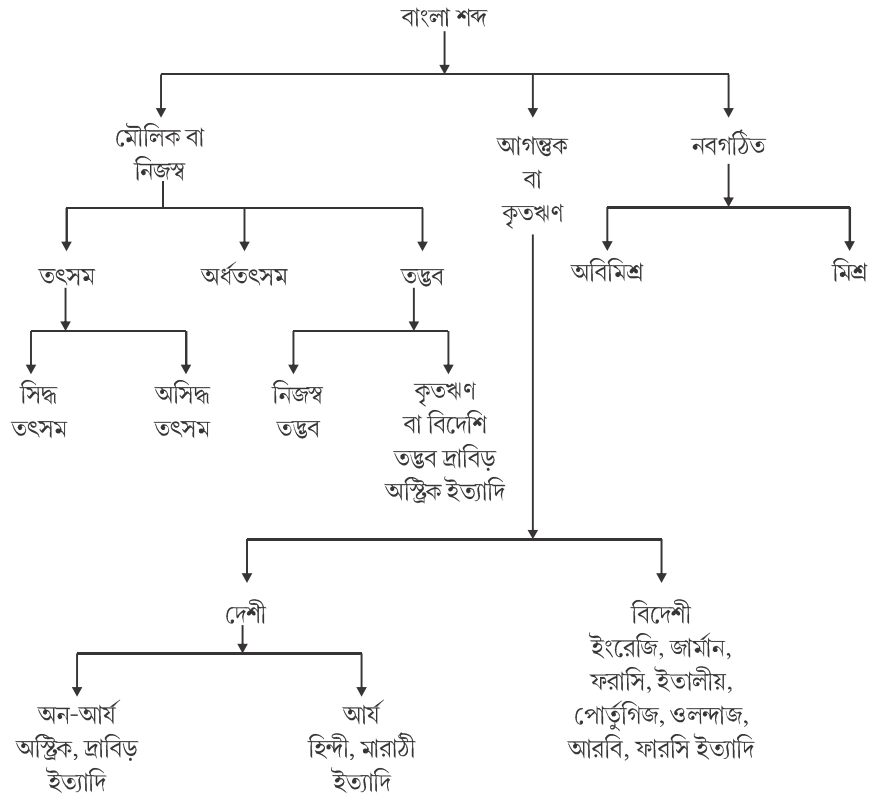

নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দুটি মুসলমান শব্দের উদাহরণ দাও যা বাংলায় প্রচলিত?

উত্তর ঃ দলিল, নাবালক (নাবালীগ)।

২। পোর্তুগিজ ভাষা থেকে বাংলায় আগত দুটি শব্দ লেখো।

উত্তর ঃ আলপিন (alfinete), সাবান (sabao)।

৩। ইংরেজি থেকে বাংলায় আগত চারটি শব্দ লেখো।

উত্তর ঃ টেবিল, চেয়ার, ক্লাস, স্কুল।

১০.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। অবস্থান অনুযায়ী রেখাচিত্রের সাহায্যে বাংলা উপভাষাগুলির শ্রেণীবিন্যাস দেখাও।

২। রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩। বঙ্গালী উপভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। মন্তব্য

৪। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলায় যে শব্দগুলির আবির্ভাব ঘটেছে তা উদাহরণ সহকারে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

১০.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

২। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

৩। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

একক-১১ ধ্বনিতত্ত্ব

বিন্যাস ক্রম

১১.১। ধ্বনিতত্ত্ব

১১.২। স্বরধ্বনি

১১.৩। ব্যঞ্জনধ্বনি

১১.৪। ধ্বনি পরিবর্তন ও তার কারণ

১১.৫। ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

১১.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১১.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১১.১। ধ্বনিতত্ত্ব

কেন্দ্রীয় ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত হল ধ্বনিতত্ত্ব।

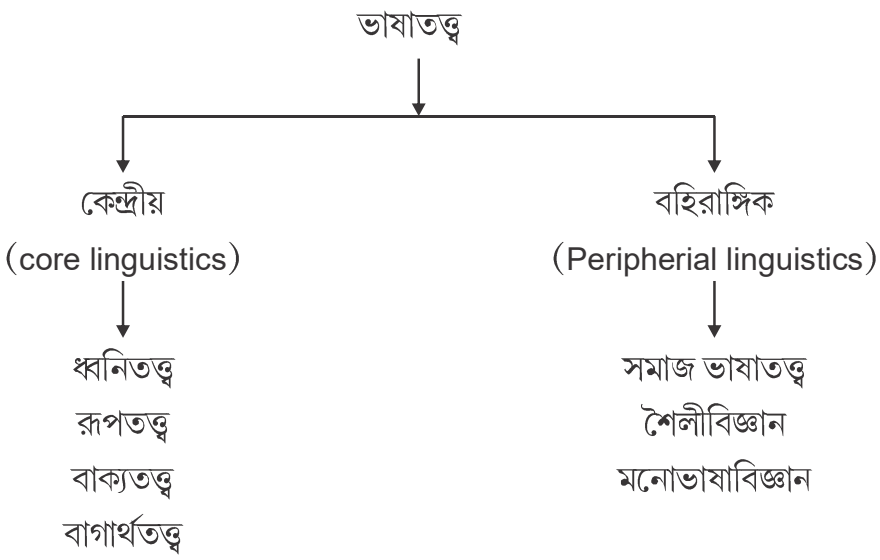

যা কিছু শ্রবণযোগ্য, তাই হল ধ্বনি। ধ্বনি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন ঃ- প্রাকৃতিক ধ্বনি, যান্ত্রিক ধ্বনি, পশুপাখির ধ্বনি, ধাতব ধ্বনি, যানবাহানের ধ্বনি, বাজির ধ্বনি প্রভৃতি। ধ্বনি তৈরির প্রধান শর্ত হল

collition বা ঘর্ষণ ও বাতাস। বাগ্‌ধ্বনি বলতে বোঝায় বাগযন্ত্র বাহিত ধ্বনিকে, যা শুধুমাত্র মানবভাষার অন্তর্গত। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত ধ্বনি বহির্গামী বায়ুস্রোতের

ফলে উৎপন্ন। একটি চিত্র দেওয়া হল ঃ-

মন্তব্য

ফুসফুস —> শ্বাসনালী (স্বরযন্ত্র-সরতন্ত্রী) —> কণ্ঠমুখ —> মুখগহ্বর (জিভ, আলজিভ, দাঁত, তালু, ঠোঁট)।

এগুলি ছাড়াও নাসাগহ্বর থেকে নাসারন্ধ্র হয়ে নাসামূল দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়।

ধ্বনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ড. রামেশ্বর শ কতকগুলি পরিভাষা (Technical Terms) ব্যবহার করেছেন। সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত ঃ-

Acoustics = ধ্বনিতরঙ্গ-বিজ্ঞান / স্বনবিজ্ঞান

Articulatory Phonetics = উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান

Auditory Phonetics = শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান

Bilingualism = দ্বিভাষিকতা

Borrowing = ভাষাঋণ

Comporative Method = তুলনামূলক পদ্ধতি

Comparative Philology = তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব / তুলনামূলক বাঙ্‌মীমাংসা

Descriptive Grammar = বর্ণনামূলক ব্যাকরণ

Descriptive Linguistics = বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

Diachronic Linguistics = কালক্রমিক / কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান

Dialect Geography = উপভাষাগত ভূগোল

Dialect Survey = উপভাষা জরিপ

Dialectology = উপভাষা বিজ্ঞান / উপভাষাতত্ত্ব

Esperanto = এস্ পেরান্তো (বিশ্বভাষা)

External Reconstruction = বাহ্য পুনর্গঠন

Geolingustics = ভৌগলিক ভাষাবিজ্ঞান

মন্তব্য

Glottochronology = শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দসৃষ্টিতত্ত্ব / শব্দ-কালক্রম-বিজ্ঞান

Grammar = ব্যাকরণ

Graphics = লিপিবিজ্ঞান

Historical Linguistics = ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান

Internal Reconstruction = আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন

International Phonetic Alphabet = আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

Language Planning = ভাষাবংশ / ভাষাপরিবার

Language Family = ভাষা-পরিকল্পনা

Lexicography = অভিধান-বিজ্ঞান

Lexico-Statistics = শব্দসমূহের অবক্ষয়ের পরিসংখ্যান / শব্দ-পরিসংখ্যান

Linguistics Outology = ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব

Linguistic Phylogeny = জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব

Linguistics = ভাষাবিজ্ঞান, বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব

Morphology = রূপতত্ত্ব

বাগধ্বনির বর্গীকরণ ঃ-

উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকে বাগধ্বনি দুরকম - স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি। বাগধ্বনি সৃষ্টিতে শ্বসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ধ্বনি তিনরকম - মৌখিক ধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি এবং উন্যাসিক্যধ্বনি। এছাড়া রয়েছে বিভাজ্য ধ্বনি এবং অবিভাজ্য ধ্বনি।

ধ্বনিতত্ত্বের বর্গীকরণ ঃ-

১। উচ্চরণমূলক ধ্বনিতত্ত্ব

২। ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিতত্ত্ব

৩। শ্রবণমূলক ধ্বনিতত্তব

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। ধ্বনিতত্ত্ব কোন্ ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত?

উত্তর ঃ ধ্বনিতত্ত্ব কেন্দ্রীয় ভাষাতত্ত্ব (core linguistics)-এর অন্তর্গত।

২। ধ্বনি কী?

উত্তর ঃ যা কিছু শ্রবণযোগ্য, তাই হল ধ্বনি।

৩। ধ্বনির কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ প্রাকৃতিক ধ্বনি, যান্ত্রিক ধ্বনি, পশুপাখির ধ্বনি, ধাতব ধ্বনি, যানবাহনের ধ্বনি, বাজির ধ্বনি

ইত্যাদি।

৪। রামেশ্বর শ প্রদত্ত দুটি পরিভাষা লেখো।

উত্তর ঃ Auditory Phonetics = শ্রবণমূলক ধ্বনিতত্ত্ব; Graphics = লিপিবিজ্ঞান।

৫। ধ্বনিতত্ত্বের বর্গীকরণ করলে কয়টি ভাগা পাওয়া যায়? কী কী?

উত্তর ঃ ধ্বনিতত্ত্বের বর্গীকরণের তিনটি ভাগ। -

১) উচ্চারণমূলক ধ্বনিতত্ত্ব,

২) ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিতত্ত্ব

এবং ৩) শ্রবণমূলক ধ্বনিতত্ত্ব।

১১.২। স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বরধ্বনি ঃ- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

স্বরধ্বনির বর্গীকরণ ঃ-

১। মুখগহ্বরস্থ জিহ্বার অবস্থান - ক) উপরনীচ ও খ) সামনে পিছনে;

মন্তব্য

২। বাইরের দিক থেকে ঠোঁটের অবস্থা;

৩। মুখগহরস্থ শূণ্যতার পরিমাপ।

১। **মুখগহ্বরস্থ জিহ্বার অবস্থানের দিক থেকে স্বরধ্বনি বর্গীকরণ ঃ-**

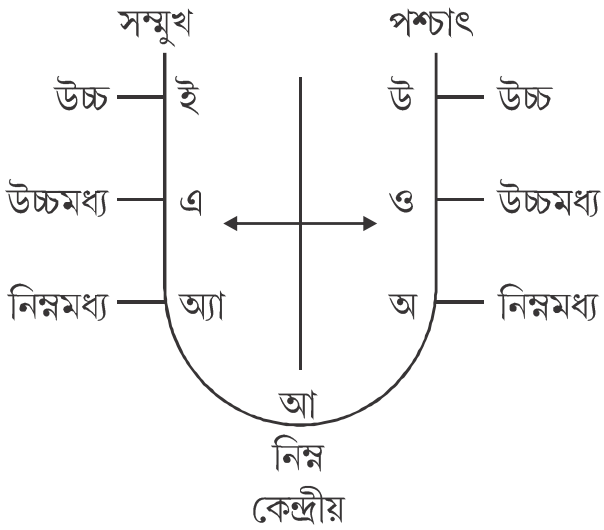

জিহ্বার অবস্থানের দিক থেকে আমরা সাতটি ভাগ পোলম। সামনে-পিছনে পেলাম-৩টি এবং উপর-নীচে পেলাম-৪টি।

২। **বাইরের দিক থেকে ঠোঁটের অবস্থা ঃ-**

উ- কুঞ্চিত; ও-অর্ধকুঞ্চিত; ই-প্রসারিত; এ-অর্ধপ্রসারিত; আ-গোলাকার; অ, অ্যা-অর্ধগোলাকার।

৩। **মুখগহ্বরস্থ শূণ্যতার পরিমাপ ঃ-**

আ-বিবৃত; উ, ই-সংবৃত; এ, ও-অর্ধসংবৃত; অ্যা, অ-অর্ধবিবৃত।

স্বরধ্বনিগুলির অবস্থান চিত্রসহ নীচে প্রদত্ত হলো ঃ-

মন্তব্য

	উচ্চ	উচ্চমধ্য	নিম্নমধ	নিম্ন	সম্মুখ	পশ্চাৎ	কেন্দ্রীয়
অ			√			√	
আ				√			√
ই	√				√		
উ	√					√	
এ		√			√		
ও		√				√	
অ্যা			√		√		

স্বরধ্বনি	জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী উপর-নীচ	সামনে-পিছনে	ঠোঁটের অবস্থা	শূণ্যতার পরিমাপ
অ	নিম্নমধ্য	পশ্চাৎ	অর্ধগোলাকার	অর্ধবিবৃত
আ	নিম্ন	কেন্দ্রীয়	গোলাকার	বিবৃত
ই	উচ্চ	সম্মুখ	প্রসারিত	সংবৃত
উ	উচ্চ	পশ্চাৎ	কুঞ্চিত	সংবৃত
এ	উচ্চমধ্য	সম্মুখ	অর্ধপ্রসারিত	অর্ধসংবৃত
ও	উচ্চমধ্য	পশ্চাৎ	অর্ধকুঞ্চিত	অর্ধসংবৃত
অ্যা	নিম্নমধ্য	সম্মুখ	অর্ধগোলাকার	অর্ধবিবৃত

১১.২। স্বরধ্বনি

যে সকল স্বরধ্বনিগুলি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, তাকে অর্ধস্বরধ্বনি বলা হয়।

বাংলায় ব্যবহৃত অর্ধস্বরধ্বনিগুলি হল- ই, উ, এ, ও।

বাংলা শব্দে পূর্ণস্বর ও অর্ধস্বরের প্রয়োগ ঃ-

জা-এ (পূর্ণ) যায় (অর্ধ)

মন্তব্য

জা-ও (পূর্ণ) যাও (অর্ধ)

জা-ই (পূর্ণ) যাই (অর্ধ)

স্বরধ্বনি	মৌখিক প্রয়োগ	আনুনাসিক প্রয়োগ
অ	গদ	গঁদ
আ	পাক / কাদা	পাঁক / কাঁদা
ই	বিধি	বিঁধি
উ	কুড়ি	কুঁড়ি
এ	একে	এঁকে
ও	ধোয়া	ধোঁয়া
অ্যা	ঢ্যাড়া (দাগ)	ট্যাঁড়া (বাদ্যযন্ত্র)

যৌগিক স্বরধ্বনি

যখন দুটি স্বরধ্বনি একসঙ্গে পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় যৌগিক স্বরধ্বনি।

উদাহরণ ঃ-

অ — নয়া (ন + অ + আ), গয়া (গ + অ + আ)

আ — আই (বুড়ো), যাও (য + আ + ও), আয় (আ + এ), মায়া (ম + আ + আ)

ই — পিউ (প + ই + উ), টিয়া (ট + ই + আ)

উ — উই, রুয়ে (র + উ + এ), শুয়ে (শ + উ + এ)

এ — এই, খেয়া (খ + এ + আ), কেও (ক + এ + ও)

ও — ওই, সয়ে (স + ও + এ), মোয়া (ম + ও + আ)

অ্যা — ম্যাও (ম + অ্যা + ও), শ্যাওলা (শ + অ্যা + ও)

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। বাংলার সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি কী কী?

উত্তর ঃ অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

২। স্বরধ্বনি বর্গীকরণের কয়টি ভাগ ও কী কী?

উত্তর ঃ স্বরধ্বনির বর্গীকরণের তিনটি ভাগ - মুখগহ্বরস্থ জিহ্বার অবস্থান, বাইরের দিক থেকে ঠোঁটের অবস্থা এবং মুখগহ্বরস্থ শূণ্যতার পরিমাপ।

১১.৩। ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না এবং সাধারণত যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়ে থাকে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। যেমন - ক্, চ্, ড্, শ ইত্যাদি। এগুলিকে শ্রুতিযোগ্য করে উচ্চারণ করতে হলে, স্বরধ্বনির আশ্রয় নিতে হয়। যেমন - ক্ (ক + অ), চ্ (চ + অ), কি (ক + ই), চা (চ + আ) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ ঃ-

১। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী;

২। উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী;

৩। তালুর অবস্থান অনুযায়ী;

৪। স্বরযন্ত্রের অবস্থা অনুযায়ী;

৫। স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা অনুযায়ী।

উদাহরণ অনুসারে বিভিন্ন ব্যঞ্জনের শ্রেণীবিভাগ প্রদত্ত হল ঃ-

১। **উচ্চরণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ ঃ-**

ক) কণ্ঠ্যনালীয় ধ্বনি (হ)

খ) জিহ্বামূলীয় ধ্বনি (ক বর্গের ধ্বনি - ক, খ, গ, ঘ, ঙ)

গ) প্রশস্ত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি (চবর্গ - চ, ছ, জ, ঝ)

মন্তব্য

ঘ) পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি (শ)

ঙ) দন্ত্যমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি (ট বর্গ - ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়)

চ) দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি (র, ল, ন, ম)

ছ) দন্ত্যধ্বনি (ত, থ, দ, ধ)

জ) ওষ্ঠ্য ধ্বনি (প, ফ, ব, ভ, ম)

ঝ) দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি (য়, ড়, f / v)

২। **উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ ঃ-**

ক) স্পর্শ ধ্বনি

খ) ঘৃষ্ট ধ্বনি

গ) নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি

ঘ) পার্শ্বিক ধ্বনি

ঙ) কম্পিত বা কম্পনজাত ধ্বনি

চ) তাড়িত ধ্বনি

ছ) শ্বাসজাত ধ্বনি বা উষ্ম ধ্বনি

খ) স্পর্শ ধ্বনি

|

অঘোষ অল্পপ্রাণ (ক, চ, ট, ত, প)

|

অঘোষ মহাপ্রাণ (খ, ছ, ঠ, থ, ফ)

|

ঘোষ অল্পপ্রাণ (গ, জ, ড, দ, ব)

|

ঘোষ মহাপ্রাণ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ)

খ) ঘৃষ্টধ্বনি (প্রধানত পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় ব্যবহৃত) মন্তব্য

|

অঘোষ অল্পপ্রাণ ( )

|

অঘোষ মহাপ্রাণ ( )

|

ঘোষ অল্পপ্রাণ ( )

|

ঘোষ মহাপ্রাণ ( )

গ) নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি (ঙ, ন, ম)

|

ঘোষ অল্পপ্রাণ (ঙ, ন, ম)

|

ঘোষ মহাপ্রাণ (ন্হ (হ্ন), ম্হ (হ্মা))

ঘ) পার্শ্বিক ধ্বনি

|

ঘোষ অল্পপ্রাণ (ল)

|

ঘোষ মহাপ্রাণ (ল্হ) (আহ্লাদ)

ঙ) কম্পিত বা কম্পনজাত ধ্বনি

|

ঘোষ অল্পপ্রাণ (র)

|

ঘোষ মহাপ্রাণ (র্হ) (হ্রদ)

মন্তব্য

চ) তাড়িত ধ্বনি

|

ঘোষ অল্পপ্রাণ (ড়)

|

ঘোষ মহাপ্রাণ (ঢ়)

ছ) শ্বাসজাত ধ্বনি বা উষ্ম ধ্বনি

|

পাশ্চাৎ দন্ত্যমূলীয় অঘোষ (শ)

|

অগ্র দন্ত্যমূলীয় অঘোষ (স)

|

দন্ত্যমূলীয় অঘোষ মূর্ধন্য (ষ)

|

দন্ত্যমূলীয় ঘোষ ((z))

|

দন্তৌষ্ঠ্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ((f))

|

দন্তৌষ্ঠ্য ঘোষ মহাপ্রাণ ((v))

|

কণ্ঠ্যনালীয় ঘোষ (হ)

|

কণ্ঠ্যনালীয় অঘোষ (ঃ)

৩। **তালুর অবস্থান অনুযায়ী ঃ-** নাসিক্য ধ্বনি

৪। **স্বরযন্ত্রের অবস্থা অনুযায়ী ঃ-** ঘোষ ধ্বনি, অঘোষ ধ্বনি

৫। **স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা অনুযায়ী ঃ-** অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

প্রশ্নত্তোর ঃ- মন্তব্য

১। ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?

উত্তর ঃ যেসকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না এবং সাধারণত যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়ে থাকে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। যেমন - ক্, চ্, ড্, শ্ ইত্যাদি।

৩। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণের দুটি ভাগ লেখো।

উত্তর ঃ কণ্ঠ্যনালীর ধ্বনি এবং জিহ্বামূলীয় ধ্বনি।

৪। উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি সাতপ্রকার। সেগুলি হল - ১) স্পর্শ ধ্বনি; ২) ঘৃষ্ট ধ্বনি, ৩) নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি; ৪) পার্শ্বিক ধ্বনি; ৫) কম্পিত বা কল্পনজাত ধ্বনি; ৬) তাড়িত ধ্বনি এবং ৯)

যুগ্মব্যঞ্জন

যখন একই ব্যঞ্জন পাশাপাশি বসবে তখন তৈরি হয় যুগ্মব্যঞ্জন।

উদাহরণ ঃ-

ক্ক — এক্কাগাড়ি, টক্কর

চ্চ — চৌবাচ্চা, চচ্চড়ি

জ্জা — লজ্জা, সজ্জা

ট্ট — অট্টালিকা

যুক্তব্যঞ্জন

ভিন্ন ব্যঞ্জন যখন পরস্পর বসবে তখন যুক্তব্যঞ্জন তৈরি হবে।

উদাহরণ ঃ-

ক — ক্রয়, বিক্রয়, কৃপাণ, অর্ক, তর্ক প্রভৃতি

খ — খ্রিস্ট, খৃষ্ট, মূর্খ ইত্যাদি

মন্তব্য

গ — গ্রাম, গ্রহ, গৃহ, বর্গ ইত্যাদি।

ঘ — ঘৃত, ঘ্রাণ, অর্ঘ্য ইত্যাদি।

ঙ — শঙ্কা, বঙ্গ, সঙ্গ, রঙ্গ ইত্যাদি।

চ — মোর্চা, বাচ্য, কুর্চি ইত্যাদি।

ছ — মূর্ছা, মৃচ্ছকটিক ইত্যাদি।

জ — বজ্র, বর্জন, বর্জ্য প্রভৃতি।

ঝ — কুজ্ঝটিকা, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি।

ঞ — ঝঞ্ঝা, অঞ্জনা ইত্যাদি।

ট — ট্রয়, আর্টপেপার, নাট্য ইত্যাদি।

ঠ — অবগুণ্ঠন, লণ্ঠন, গোষ্ঠ, ষষ্ঠ ইত্যাদি।

ণ — ঢেণ্ঢন, কাহ্ন, পূর্ণ ইত্যাদি।

ত — ত্রাণ, তৃণ, প্রাপ্ত ইত্যাদি।

থ — থ্রোবল, অর্থ, তথ্য, ইত্যাদি।

দ — দ্রাবিড়, দৃঢ়, বাদ্য, গর্দান, উদ্ধার ইত্যাদি। শ্বাসজাত ধ্বনি বা উষ্ম ধ্বনি।

ধ — ধৃত, অর্ধ, দুর্বোধ্য, ধ্রুব, যুদ্ধ ইত্যাদি।

ন — নৃপ, পুনর্নবা, অন্য, রত্ন, স্নান ইত্যাদি।

প — অর্পণ, পৃষ্ঠা, প্রাপ্য, চ্যাপ্টা ইত্যাদি।

ফ — ফ্রী, ফ্যান, আস্ফালন, গুল্ফ ইত্যাদি।

ব — বৃত্ত, সর্ব, ব্যাঞ্জন, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

ভ — ভ্রমণ, ভৃত্য, লভ্য, অদ্ভূত ইত্যাদি।

ম — ম্রিয়মাণ, মৃত্যু, গ্রীষ্ম, রুক্মিণী ইত্যাদি।

<u>তিনটি ধ্বনির যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ ঃ-</u>

উজ্জ্বল, উচ্ছ্বাস, সত্ত্বেও, সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি।

চারটি ধ্বনির যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ ঃ-

মন্তব্য

স্বাতন্ত্র্য, ঊর্দ্ধ ইত্যাদি।

অনেকসময় যুক্তব্যঞ্জন শব্দের সূচনায় স্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু শব্দের মধ্যে ও শেষে শব্দের দলবিভাজনের কারণে তারা কখনো যুক্তব্যঞ্জনের বদলে দুটি পৃথক দলে একক ব্যঞ্জনরূপে উচ্চারিত হয় বা দুটি পৃথক দলে বিভাজ্য হবার দরুণ যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনিগুলির যুগ্মরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ- ধ্রু-ব, বিদ্-ধৃ-ত, শ্রী, বিশ-শ্রী ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষরের মধ্যে 'র' ফলার অন্তর্নিহিত 'র্' স্বরধ্বনি থাকলেও প্রয়োগে কিন্তু অন্যান্য স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ- ত্রাণ, ক্রেতা, খ্রিস্টাব্দ, প্রবল ইত্যাদি। কিন্তু 'ঋ' ফলার অন্তর্নিহিত 'ই' স্বরধ্বনিটি বদল হয় না। যেমন ঃ- নৃপ, কৃপাণ ইত্যাদি।

'ল' ও 'র' সংযুক্ত ধ্বনির উপাদান রূপে ব্যবহৃত হলে স্পর্শধ্বনি, ঘৃষ্টধ্বনি ও নাসিক্যধ্বনি পরে বসে। কিন্তু ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি যদি যুক্তব্যঞ্জনের উপাদান হয়, তাহলে তা স্পৃষ্ট ধ্বনি, তরলধ্বনি ও নাসিক্য ধ্বনির পূর্বে বসে।

পশ্চাৎ — ক্লীব, শ্লেষ, মৃত, ম্রিয়মাণ ইত্যাদি।

পূর্বে — আস্কারা, স্খলন, স্পৃহা ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দুটি যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ গ্রাম, বাচ্য।

২। দুটি যুগ্মব্যঞ্জনের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ লজ্জা, গপ্পো।

১১.৪। ধ্বনি পরিবর্তন ও তার কারণ

ভাষার পরিবর্তন হয় তার দেহে এবং আত্মার অর্থাৎ তার বহিরাঙ্গ গঠনে এবং অন্তরঙ্গ গঠনে। ভাষার বহিরাঙ্গ গঠনের মূল উপাদান ভাষার ধ্বনি এবং অন্তরঙ্গ গঠনের মূল

মন্তব্য

উপাদান তার অর্থ। ভাষার পরিবর্তনের দুটি দিক হল - ধ্বনির পরিবর্তন (Sound Change) এবং অর্থ পরিবর্তন (Semantic Change)।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ধ্বনি পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যেমন ঃ-

১। ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু;

২। অন্যজাতির ভাষায় প্রভাব;

৩। উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা;

৪। শ্রবণের ও বোধের ত্রুটি;

৫। সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব।

১। ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু ঃ-

কোনো একটি দেশের জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে সেখানকার ভূপ্রকৃতি রূক্ষ, কঠোর সেখানকার ভাষায় কর্কশতা ও কঠোরতা বেশি; আবার যেখানকার ভূপ্রকৃতি বর্ষাস্নিগ্ধ কোমল সেখানকার ভাষার কোমলতা ও মাধুর্য বেশি। এই কারণে জার্মান ও ইংরেজি ভাষা অপেক্ষাকৃত কর্কশ; কিন্তু ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর। এরকমই বর্ষাস্নাত সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের মানুষর ভাষা পশ্চিম ভারতের শুষ্ক, কঠোর প্রকৃতিতে অবস্থিত মানুষের ভাষা থেকে অপেক্ষাকৃত মধুর।

২। অন্যজাতির ভাষায় প্রভাব ঃ-

কোনো একটি জাতি অন্যজাতির শাসনে থাকলে সেই শাসিত জাতির ভাষার প্রভাব জাতিটির উপর পড়ে। পশ্চিম বাংলার চলিত বাংলায় তিনপ্রকার শিস্‌ধ্বনির (শ্‌, ষ্‌, স্‌) মধ্যে স্বনিম বা মূলধ্বনি হিসাবে 'শ্‌'-ই স্বীকৃত। কিন্তু পূর্ব বাংলায় ফরাসী প্রভাবের ফলে 'স্‌'-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। অন্য স্বরধ্বনি না থাকলে 'অ' বা 'ও' উচ্চারিত হয়। যেমন- 'নন্দ্‌'-এর বাংলা উচ্চারণ 'নন্দো'। তবে বর্তমান হিন্দীর প্রভাবে যুক্তব্যঞ্জন কোথাও কোথাও স্বরহীনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন ঃ- ধর্মঘট

অর্থে 'বন্ধ্'। মন্তব্য

৩। **উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা ঃ-**

ভাষা ব্যবহার ও ভাষা সঞ্চারের ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বক্তা যদি ধ্বনি উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করতে চায় তাহলে সে অনেক জটিল ধ্বনি-সমাবেশকে সহজ করে ফেলে। যেমন - যুক্তব্যঞ্জনকে পৃথক করে উচ্চারণ করে। যেমন ঃ- 'লক্ষ্মী' শব্দের যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ + ষ্ + ম্' বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে শুধু 'ক্ + খ্' হয়েছে, 'ম্' লোপ পেয়েছে। বক্তার অনবধানতা বা সাবধানতার অভাবেও ত্রুটি হতে পারে। যেমন- তাড়াহুড়ো করে 'এক কাপ চা' বলে গিয়ে আমরা 'এক চাপ কা' বলে ফেলি।

৪। **শ্রবণের বা বোধের ত্রুটি ঃ-**

বক্তার উচ্চারণের ত্রুটির ফলে শ্রোতার শোনার বা বোঝার ত্রুটি ঘটতে পারে। যেমন ঃ- ইংরেজি 'Zeal' শব্দের উচ্চারণ বাঙালীরা করেছে 'জীল্'-এটি শ্রোতারই ত্রুটি। আবার জার্মান 'Zar'-এর উচ্চারণ বাঙালীদের শ্রবণের ত্রুটির ফলে হয়েছে 'জার্'; আসলে 'Zar'-এর মূল জার্মান উচ্চারণ 'ৎসার্'।

৫। **সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব ঃ-**

একই ভাষার নিজস্ব একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন হয়। একটি শব্দের সাদৃশ্যে অন্য শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন হয়, ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে ধ্বনিক্ষয় হয় ও ভাষায় নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়। একই মূলধ্বনি বা স্বনিমের উপধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার ফলে ভাষায় নতুন মূলধ্বনি বা স্বনিমের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ঃ- বাংলার 'অ্যা' ধ্বনি (অ্যাখন, অ্যামন), বাংলার 'ড়', 'ঢ়' ধ্বনি (বড়, দৃঢ়) ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের মূল উপাদান কী?

উত্তর ঃ ভাষার বহিরাঙ্গ গঠনের মূল উপাদান ভাষার ধ্বনি।

মন্তব্য ২। ভাষার পরিবর্তনের দুটি দিক কী কী?

উত্তর ঃ ভাষার পরিবর্তনের দুটি দিক ধ্বনি পরিবর্তন এবং অর্থপরিবর্তন।

১১.৫। ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

প্রধানত চারটি ধারায় ভাষার বহিরঙ্গগত কারণে ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে থাকে। সেগুলি হল ঃ- ১) ধ্বনির আগম, ৩) ধ্বনির লোপ, ৩) ধ্বনির রূপান্তর এবং ৪) ধ্বনির স্থানান্তর ও বিপর্যাস।

১। **ধ্বনির আগম ঃ-** দুরকম ভাবে ধ্বনির আগম হয়ে থাকে - স্বরধ্বনির আগম এবং ব্যঞ্জনধ্বনির আগম। শব্দের মধ্যে যে স্থানে স্বরধ্বনিটি এসে যুক্ত হয় সেই হিসাবে স্বরধ্বনির আগমকে তিনভাবে ভাগ

করা যায়। যেমন- আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis), মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) ও অন্ত্যস্বরাগম (catathesis)। এছাড়া কোনো কোনো অপিনিহিত (Epenthesis) স্বরাগমের মধ্যে পড়ে।

বিভিন্ন ভাগের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত ঃ-

আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis) ঃ- স্পৃহা > আস্পৃহা; স্কুল > ইস্কুল; স্টেবল > আস্তাবল।

মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) ঃ- ভক্তি > ভকতি; মনোহর্থ > মনোরথ; গ্লাশ > গেলাশ ইত্যাদি।

অপিনিহিতি (Epenthesis) ঃ- অপিনিহিতি হলো আসলে মধ্যস্বরাগম। যেমন- বাক্য > বাইক্ক; যজ্ঞ > যইগ্গ ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বরাগম (Vowel Catathesis) ঃ- বেঞ্চ > বেঞ্চি; গিল্ট > গিল্টি; কিস্ত্ > কিস্তি; সং পরিষদ > পালি পরিসদা; সৎ দিশ্ > বাংলা দিশা ইত্যাদি।

আদি ব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis) ঃ- ঋজু > উজু > রুজু; উপাধ্যায় > প্রাকৃত উব্জ্ঝাঅ > বাংলা ওঝা > রোজা ইত্যাদি।

অন্তব্যঞ্জনাগম (Consonant Catathesis) ঃ- সৎ সর্ব + জি > সর্বজিৎ; মন্তব্য বাংলা খোকা > খোকন; বাবু > বাবুন।

মধ্যব্যঞ্জনাগম বা শ্রুতিধ্বনি (Glide) ঃ- শব্দমধ্যে যে ব্যঞ্জনের আগম হয় সেই ব্যঞ্জনের নাম অনুসারে শ্রুতির নামকরণ হয়। যেমন ঃ-

য়-শ্রুতি (y-glide) ঃ- মোদক > মোআ > মোয়া; লৌহ > নোআ > নোয়া ইত্যাদি।

ওয়-শ্রুতি (w-glide) ঃ- যাআ > যাওয়া; খাআ > খাওয়া; শোআ > শোওয়া ইত্যাদি।

হ-শ্রুতি (h-glide) ঃ- বিপুলা > বিউলা > বিহুলা > বেহুলা; Viola (Violin) > বেআলা > বেহালা ইত্যাদি।

দ-শ্রুতি (d-glide) ঃ- বৈদিক সূনর > ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সুন্দর; ইংরেজি General (জেনারেল্) > জান্দরেল > জাঁদরেল।

ব-শ্রুতি (b-glide) ঃ- সংস্কৃত তাম্র > তম্ব্র > প্রাকৃত তম্ব > বাংলা তাঁবা ইত্যাদি।

২। **ধ্বনির লোপ ঃ-**

বিভিন্ন ভাবে ধ্বনির লোপ হয়ে থাকে। উদাহরণ সহকারে সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত ঃ-

আদিস্বরলোপ (Aphesis) ঃ- উদ্ধার > উধার > ধার; অলাবু > লাউ ইত্যাদি।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope) ঃ- গামোছা > গামছা; সুবর্ণ > স্বর্ণ ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope) ঃ- রাশি > রাশি; সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রিকাতা / দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism / Bisyllabism) ঃ- গামোছা > গাম্ছা; অপরাজিতা > অপ্রাজিতা ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ ঃ- আমের রস > রামের অস; সখী > সহি > সই; ভক্ত > ভত্ত >

মন্তব্য

ভাত ইত্যাদি।

সমাক্ষর লোপ (Haplology / Syllabic Syncope) ঃ- বড় দাদা > বড়দা; পাদোদক > পাদক ইত্যাদি।

সমবর্ণ লোপ (Haplography) ঃ- ইংরেজিতে আগে Krishnagar লেখা হত। কিন্তু লোকের মুখে দুটি 'ন' উচ্চারিত হয়- ক্রিশনোনগর।

৩। **ধ্বনির রূপান্তর ঃ-**

ধ্বনির রূপান্তরের বিভিন্ন বিভাগ উদাহরণ সহকারে নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

অভিশ্রুতি (Umlaut) ঃ- করিয়া > কইর‍্যা > করে; বাক্য > বাইক্ক > বাক্কো; যজ্ঞ > যইগ্গ > যোগ্‌গো ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতি (Vonel Harmony) ঃ- সুপারি > সুপুরি; পূজা > পূজো ইত্যাদি। দেশী > দিশি, বিলাতি > বিলিতি; যদু > যোদো ইত্যাদি। ধ্বনি পরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে স্বরসঙ্গতিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ- ক) প্রগত (Progressive); খ) পরাগত (Regressive); গ) পারস্পরিক বা অন্যোন্য (Mutual)।

সমীভবন (Assimitation) ঃ- উৎলাস > উল্লাস; যক্ষা > যক্‌খা; সৎমান > সম্মান; ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissimilation) ঃ- লালা > নাল; চন্দননগর > ইং Chandernagore; সৎ পিপীলিকা > পালি কিপিল্লিকা; চুঁচুড়া > ইংরেজি Chinsurah ইত্যাদি।

ঘোষীভবন (Voicing) ঃ- চাকদহ > চাগ্‌দা; দিক্‌বিজয় > দিগ্বিজয়; ছোট্‌দিদি > ছোড়দি; কাক > কাগ; লোক > লোগ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) ঃ- স্তম্ভ > থাম; পাঁচ হালা > পাঁছালা; পুস্তক > পুঁথি ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration) ঃ- শৃঙ্খল > শিংকল > শিকল; দুধ > দুদ;

বাঘ > বাগ; ভাই > বাই; ভাত > বাত ইত্যাদি। মন্তব্য

নাসিক্যীভবন (Nasalization) ঃ- বন্ধ > বাঁধ; অঙ্ক > আঁক; পঙ্ক > পাঁক ইত্যাদি।

স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalization) ঃ- পুস্তক > পুথি > পুঁথি; পেচক > পেঁচা ইত্যাদি।

বিনাসিক্যীভবন (Denasalization) ঃ- শৃঙ্খল > শিকল > শেকল; বাংলা পাঁচ > ফরাসী স্যাঁক ইত্যাদি।

মূর্ধন্যীভবন (Carebralization) ঃ- বৃদ্ধ > বুড্ঢ > বুড়া; বিকৃত > বিকট; উৎ ডীন > উড্ডীন ইত্যাদি।

স্বতোমূর্ধন্যীভন (Spontaneous Cerebratlisation) ঃ- সং পততি > প্রা. পড়ই > বাংলা পড়ে ইত্যাদি।

তালব্যীভবন (Palatatisation) ঃ- সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ; কুৎসা > কেচ্ছা; institute > ইন্স্টিচিউট; graduate > গ্র্যাজুয়েট।

উষ্মীভবন (Spirantisation) ঃ- হয় হয় জানতে পারো না > 'অয় অয় জান্তি পারো না' (জ > Z); কালীপূজা > খালী ফুজা।

সকারীভবন (Assibilation) ঃ- আগাপাছতলা > আগাপাস্তলা; খেয়েছে > খাইসে।

রকারীভবন (Rhotacism) ঃ- লাতিন ausasa > auzoza > aurora; ষট্ + দশ > ষোড়শ > ষোল ইত্যাদি।

সঙ্কোচন (Contraction) ঃ- বৈবাহিক > বেয়াই > ব্যাই; যাহা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছেতাই; জামাইবাবু > জাঁইউ; ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা > ইঁদারা; পেঁয়াজ > প্যাঁজ ইত্যাদি।

বিস্ফোরণ বা প্রাসরণ (Expansion) ঃ- পোর্তুগীজ পেরা > বাংলা পেয়ারা; সংস্কৃত পর্যঙ্ক > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক ইত্যাদি।

মন্তব্য

৪। **ধ্বনির স্থানান্তর ঃ-**

বিভিন্ন কারণে ধ্বনির স্থানান্তর হতে পারে।

বিপর্যাস (Metathesis) ঃ- বাক্স > বাস্ক; রিক্শা > রিশ্কা; বেনারসী > বনারস > বেনারস; গর্দভ > গদ্দহ > গাধা; আধিক্যতা > আদিখ্যেতা ইত্যাদি।

দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস / স্পু নারিজম্ (Spoonerism) ঃ- এক কাপ চা > এক চাপ কা।

সাদৃশ্য ঃ- সাদৃশ্যের ফল চাররকম ঃ- শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন, শব্দের রূপপরিবর্তন, শব্দের অর্থপরিবর্তন এবং নতুন শব্দসৃষ্টি। যেমন ঃ- আম্মার, তোম্মার, সম্মার; হসপিটাল > হাঁসপাতাল।

বিমিশ্রণ বা মিশ্রণ (Contamination) ঃ- পোর্তুগীজ আনানস শব্দের 'নস' অংশটুকু বাদ দিয়ে অনারস হয়েছে।

জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word) ঃ- নিশ্চল ও চুপ শব্দ মিলে হয়েছে নিশ্চুপ; হাঁস ও সজারু মিলে হয়েছে হাঁসজারু; Smoke ও Fog থেকে হয়েছে Smog ইত্যাদি।

সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) ঃ- মাস্টার + ঈ = মাস্টারী; নি + খরচা = নিখরচা ইত্যাদি।

লোকনিরুক্তি (Flok Etymology) ঃ- 'টাকার কুমীর', 'আরাম কেদারা' ইত্যাদি।

শব্দবিভ্রম (Malapropism) ঃ- 'উদ্বাহ বন্ধনে' > 'উদ্বন্ধনে'; 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' > শ্রীমতি ভগবতীর গীতা; 'গীতগোবিন্দ' > 'বিন্দা দূতী' ইত্যাদি।

ভুয়া শব্দ (Ghost Word) ঃ- 'প্রোথিত' (প্রোত্ ধাতু)।

পুনর্গঠন বা পূর্বস্তরীয় গঠন (Back Formation) ঃ- গ্রীক দ্রাখ্মে > সংস্কৃত দ্রম্য; গ্রীক ক্যামেলস্ > সং ক্লমেলক; পোর্তুগীজ viola > সাধু বাংলা বেহালা ইত্যাদি।

সম্মুখ ধ্বরিপরিবর্তন (Convergent Phonemic Change) ঃ- মন্তব্য

ব্যাকুল > বাউল; বাতুল > বাউল; শ্রবণ > শোনা; সুবর্ণ > সোনা ইত্যাদি।

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) ঃ- ভণ্ড > ভান > ভাঁড়; চিত্র > চিতা / চিত্তির; শ্রদ্ধা > সাধ /ছেদ্দা ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ধ্বনিপরিবর্তনের কয়টি ধারা ও কী কী?

উত্তর ঃ ধ্বনিপরিবর্তনের চারটি ধারা। সেগুলি হল - ধ্বনির আগম, ধ্বনির লোপ, ধ্বনির রূপান্তর এবং ধ্বনির স্থানান্তর।

২। অন্ত্যস্বরাগমের দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ বেঞ্চ > বেঞ্চি; কিস্ত্ > কিস্তি।

১১.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। স্বরধ্বনির বর্গীকরণ করে তার বিভিন্ন অংশ আলোচনা করো।

২। ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ করে ব্যঞ্জনধ্বনির সম্পর্কে যথার্থ আলোচনা করো।

৩। ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

একক-১২ শব্দার্থতত্ত্ব (Sementies)

বিন্যাস ক্রম

১২.১। শব্দার্থের পরিচয়

১২.২। শব্দার্থ নিরূপণ পদ্ধতি

১২.৩। শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের কারণ

১২.৪। অর্থপরিবর্তনের ধারা

১২.৫। অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি

১২.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১২.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১২.১। শব্দার্থের পরিচয়

প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিদ্দের মতে শব্দের অর্থের ভাগ তিন, চার বা পাঁচ প্রকার। তবে শব্দার্থের তিনটি বিভাগই অধিক পরিচিত। সেগুলি হল ঃ- ১) যৌগিকার্থ; ২) লক্ষকার্য বা রূঢ়ার্থ এবং ৩) যোগরূঢ়।

১। **যৌগিকার্থ ঃ-** যেমন, /পক্ষী/ বা /পাখি/ শব্দের দ্বারা পাখা যুক্ত বা পক্ষ যুক্ত প্রাণী বোঝায় বলে এবং শব্দগুলির অর্থ যৌগিক। /পৌত্র/ শব্দের অর্থ /পুত্রের পুত্র/ এটির অর্থ যৌগিক। /দর্শনীয়/ শব্দের অর্থ 'দর্শনযোগ্য', /সুখবর/ 'ভালো খবর', /নির্গত/ 'বহির্গত, /সত্যবাদী/ 'যিনি সত্য কথা বলেন'।

২। **লক্ষকার্য বা রূঢ়ার্থ ঃ-** যেসকল শব্দের যৌগিক অর্থ কিছুমাত্র নেই, অন্য একটি অর্থ তাতে আরোপিত বা সংযুক্ত হয়েছে তাকে বলে লক্ষকার্য বা রূঢ়ার্থ। /ছাত্র/ শব্দের মূল উপাদান /ছত্র/ তার সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক নেই /ছাত্র/ শব্দের অর্থের। তেমনি /গুরু/ যার মূল অর্থ 'ভারী' তার সঙ্গে এর সাধারণ অর্থের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।

৩। **যোগরূঢ় শব্দ ঃ-** যৌগিক শব্দার্থের মতো শব্দের মূল উপাদানের অর্থ উপসর্গ-প্রত্যয়াদির অর্থ সংযোগ বা সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ সংযোগ অবলম্বন করে

সমগ্রভাবে যে-অর্থ হওয়া উচিত তা না বুঝিয়ে তার অন্তর্গত একটি বিশেষ অর্থ বোঝায়। মন্তব্য

যেমন ঃ- /পঙ্কজ/ 'পঙ্কে যা জন্মায়' তাদের সকলকে না বুঝিযে

'পদ্মকেই' বোঝায়। /সুহৃৎ/ 'সুন্দর হৃদয় যার' বলতে সকলকে না বুঝিয়ে 'বন্ধুকে' বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শব্দার্থের প্রধান তিনটি ভাগ কী কী?

উত্তর ঃ শব্দের প্রধান তিনটি ভাগ হল- যৌগিকার্থ, লক্ষণার্থ বা রূঢ়ার্থ, যোগারূঢ় শব্দ।

২। যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'ভিক্ষু' বলতে ''বিশেষ ধরনের সন্ন্যাসী যারা ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে'' তাদের বোঝায়। 'পঙ্কজ' বলতে 'পঙ্কে যা জন্মায়' তাদের সকলকে না বুঝিয়ে 'পদ্মকেই' বোঝায়।

১২.২। শব্দার্থ নিরূপণ পদ্ধতি

ভাষার শব্দার্থ বিকীরণের ফলে একটি শব্দের একই সঙ্গে বহু প্রকার শব্দার্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। ইংরেজি ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন connotation, denotation ছাড়া context বা প্রসঙ্গার্থ (প্রকরণ) এবং collocation বা অন্য পদসংযোগ (বাক্য) শব্দার্থ নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য।

ক) অন্য পদসংযোগ (Collocation) ঃ-

বাংলায় যখন আমরা /খাওয়া/ ক্রিয়ার ব্যবহার করি তখন এর সঙ্গে অন্য পদসংযোগ বা collocation অর্থ নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। কারণ আমরা যেমন 'শক্ত জিনিস' খাই (eat) তেমনি 'জল-চা' ও খাই (drink) আর 'তামাক-সিগারেটও' খাই (smoke), আবার 'পানও খাই' (cheat, চিবাই) এমন কি 'হাওয়াও খাই' (বায়ুসেবন, enjoy) , তেমনি আবার 'কাটা' শব্দ দিয়ে শুধু ছেদন করাকেই বোঝায় না। যেমন- দিন কাটা, রাত কাটা, জিভ কাটা, কথা কাটাকাটি, চিমটি কাটা, ভেঙচি

মন্তব্য কাটা, জাবর কাটা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি অনেক কিছুই বোঝাতে পারে।

খ) <u>প্রকরণ বা প্রসঙ্গ (content) ঃ-</u>

Content বা প্রসঙ্গ অনেক সময় শব্দার্থ নিরূপণে সাহায্য করে। যেমন ঃ- /পাথর/ বলতে আমাদের যে ধারণা হয়, মণিকারের কাছে ঠিক সে ধারণা হবে না বা মণির প্রসঙ্গ নিয়ে যখন আলোচনা হবে তখন পাথর বললে ঐ মণি জাতীয় বুঝতে হবে।

/তার/ অর্থে আমরা যা বুঝি সেতারের তার বা গীটারের তার অনেকটা সেই ধরনের হলেও আলাদা, কিন্তু

টেলিগ্রাম অর্থে /তার/ একটি বিশিষ্টার্থক ব্যবহার।

গ) <u>অর্থ-সামর্থ্য (Connotation-Denotion) ঃ-</u>

অর্থ-সামর্থ্য অনুযায়ী যে-শব্দার্থ নিরূপিত হয় তার উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় / প্রণাম/ এবং /নমস্কার/ দুটিই নমস্কারের শব্দ কিন্তু /প্রণাম/ করায় মাথা নত করতে হয়। /নমস্কার/ বোঝাতে হাত তুলে অভিবাদন বোঝায়।

ঘ) <u>ঔচিত্য (Local and Historical distribution) ঃ-</u>

বাংলায় হয় /দড়ি পাকানো/, হিন্দিতে /রুটি পাকানো/ (রান্না করা) হয়; বাংলায় /তিনি শুয়েছেন/ 'ঘুমিয়েছেন' অর্থে নয় শুধু 'শয়ান আছেন' অর্থে কিন্তু হিন্দীতে /সো গয়া/ অর্থে 'ঘুমিয়েছেন'। ফারসীতে /মুর্খ/ 'পক্ষী', বাংলায় 'হত্যা করা'।

/নাগর/ শব্দের অর্থ প্রাচীনকালে ছিল 'বিদগ্ধ, নগরবাসী' এখন বাংলায় এর অর্থ 'অবৈধ প্রেম'।

/মন্দির/ শব্দের অর্থ আগে ছিল 'গৃহ', এখন এর অর্থ হয়েছে 'দেবালয়'।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। অন্য পদসংযোগ এবং প্রকরণ বা প্রসঙ্গের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

উত্তর ঃ অন্য-পদসংযোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল collocation প্রকরণ বা প্রসঙ্গের

ইংরেজি প্রতিশব্দ হল context।

২। অর্থ-সামর্থ্য এবং ঔচিত্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

উত্তর ঃ অর্থ-সামর্থ্য এবং ঔচিত্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ যথাক্রমে- connotation – Denotation, Local and Historical Distribution।

১২.৩। শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের কারণ

আত্রাহাস নোয়াম চমস্কি যে নতুন রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রবর্তন করেছেন, তাতে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শব্দার্থই হল ভাষার প্রাণ; এই ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics।

ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থপরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে। এই কারণগুলিকে দুটি

শ্রেণীতে ভাগ করা যায় - ১) স্থূল কারণ এবং ২) সূক্ষ্ম কারণ।

এই স্থূল কারণগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত- ক) ভৌগোলিক, খ) ঐতিহাসিক এবং উপকরণ গত।

সূক্ষ্মকারণগুলি আবার চারভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল- ক) সাদৃশ্য, খ) মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, গ) শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা এবং ঘ) আলঙ্কারিক প্রয়োগ।

অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণ ঃ-

ক) ভৌগলিক কারণ ঃ-

ভৌগলিক পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হলে একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন- মূল শব্দ 'অভিমান' বাংলার কোমল প্রকৃতি কোমল অনুভূতি 'স্নেহমিশ্রিত অনুযোগে'র ভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিম ভারতের কঠিন কঠোর শুষ্ক প্রকৃতিতে 'অভিমান' শব্দের অর্থ 'অহংকার' বা 'অহংভাব'। বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুতে আমিষ আহারই অনুকুল তাই বাংলায় 'শাক' বলতে বিশেষ একধরনের

মন্তব্য

ভোজ্যপত্রকেই বোঝানো হয়। কিন্তু পশ্চিম ভারতের জলবায়ুতে নিরামিষ আহার অনুকুল বলে 'শাক' শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষণীয়- সেখানে যেকোনো নিরামিষ তরকারিই 'শাক' অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দীতে 'জহর' বিষ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। বাংলায় 'মহামূল্য প্রান্তর' বোঝায়।

হিন্দীতে 'নাউ' শব্দের অর্থ নাপিত। বাংলায় এটির আঞ্চলিক উচ্চারণে লাউ হয়ে যায়।

হিন্দীতে 'দাই' শব্দটি দামী অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাংলায় 'ধাত্রী' বা প্রসূতির পরিচর্য্যকারিণী বোঝায়।

'লগন' বলতে বাংলায় বোঝায় 'বিবাহ লগ্ন কাল' কিন্তু হিন্দীতে বোঝানো হয় 'খাজনা' অর্থে।

হিন্দীতে 'বরাবর', শব্দটির অর্থ 'তুল্য', কিন্তু বাংলায় এর অর্থ 'সর্বদা'।

খ) <u>ঐতিহাসিক কারণ ঃ-</u>

ঐতিহাসিক কারণের ফলেও শব্দার্থের পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত 'দ্বি-বর' থেকে বাংলায় 'দেবর' (দেওর) কথাটি এসেছে। আগে স্বামীর ভাইকে দ্বিতীয় স্বামীরূপে বরণ করার প্রথা ছিল, ক্রমে এই ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে 'দ্বিবর' থেকে আগত 'দেওর' শব্দটি 'দ্বিতীয় স্বামী' অর্থে নয়; শুধু 'স্বামীর ভাই' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

আদিমকালে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। 'বিবাহ' কথাটি বিশেষ রূপে বহন করার অর্থেই প্রযুক্ত হত। কিন্তু এখন যেখানে বহন করার প্রশ্নই নেই, এমনকি পাত্রই যেখানে ঘরজামাই হয়ে থাকতে পারে সেখানেও বিবাহ কথার প্রচলন আছে।

'শ্বশুর' বলতে প্রাচীনকালে বোঝাতো শুধু স্বামীর পিতাকে কিন্তু এখন মেয়ের পিতাকেও 'শ্বশুর' বলা হয়।

'কুরুক্ষেত্র' অর্থে কুলুক্ষেত্তর, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-স্থানের মতো তুমুল কলহ ও শোরগোল বলা হয়।

‘ধরণী দ্বিধা হও’, ‘শিখণ্ডী খাড়া করা’; ‘ঘরশত্রু বিভীষণ’; ‘কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ’; ‘বালী-সুগ্রীবের ঝগড়া’; ‘মৃত্যুবাণ’ প্রভৃতি শব্দও দৈনন্দিন জীবনে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। মন্তব্য

গ) উপকরণগত কারণ ঃ-

যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয় সেই উপকরণের নাম বা ধর্ম অনুসারে অনেকসময় বস্তুটির নামকরণ করা হয়। কিন্তু পরে সেই উপকরণটির পরিবর্তন ঘটলেও পুরোনো নামটিই থেকে যায়।

যেমন ঃ- আগে ‘কালি’ বলতে শুধু কালো রঙের তরল পদার্থকে বোঝাতো। কিন্তু এখন ‘কালি’ বলতে ‘লাল’, ‘নীল’, ‘সবুজ’ প্রভৃতি রঙের তরল পদার্থকেও বোঝায়।

‘কলম’ শব্দের অর্থ ছিল ‘খাগ’ বা ‘শর’ এখন লেখার জন্য খাগ বা শর ব্যবহার করা না হলেও ‘কলম’ নামটি থেকেই গেছে।

‘ঘড়ি’ শব্দটির অর্থ একসময় ছিল ‘সময় বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত ছোট ঘট বা ঘড়া’। এখন ‘ঘড়ি’ কথার অর্থ দাঁড়িয়েছে ‘সময় বোঝাবার যন্ত্র’।

অর্থ পরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ ঃ-

ক) সাদৃশ্য ঃ-

সাদৃশ্যের প্রভাবে অর্থ পরিবর্তন ঘটে। এই অর্থ পরিবর্তন দুভাবে হয়- একটি শব্দের ধ্বনির সঙ্গে অন্য শব্দের সাদৃশ্য এবং একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য।

যেমন- ‘রোদসী’ শব্দের সঙ্গে ‘ক্রন্দসী’ শব্দের সাদৃশ্যের ফলে তার অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বৈদিক ভাষায় ‘ক্রন্দসী’ শব্দের মূল অর্থ ‘গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী’ সৈন্যদ্বয়’; আর ‘রোদসী’ শব্দের অর্থ হল ‘দুই জগৎ’ (স্বর্গ ও পৃথিবী), তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে অন্তরীক্ষ।

খ) মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার ঃ-

সাধারণ লোকের ধারণা অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে

মন্তব্য

নেই। তাই অনেক সময় এইসকল অশুভ বিষয়কে শুভ বা শোভন নাম দেওয়া হয়, একে সুভাষণ (euphemism) বলে।

যেমন- 'মৃত্যু' অর্থ 'গঙ্গালাভ করা'; 'সাপ' অর্থে 'লতা'; 'আর সন্তান দিও না'- এই অর্থে 'আর না কালী' থেকে 'আন্নাকালী'।

'মায়ের অনুগ্রহ' বা 'দয়া' বলতে 'বসন্ত' রোগের আক্রমণ বোঝায়।

যখন কোনো জিনিস সংসারে থাকে না তখন বলা হয় 'বাড়ন্ত'। যেমন- 'চাল বাড়ন্ত', 'ডাল বাড়ন্ত', 'মশলা বাড়ন্ত' ইত্যাদি।

স্ত্রীরা স্বামীর নাম গোপন রেখে 'উনি', 'তিনি' বলে সম্বোধন করে।

গ) <u>শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা ঃ-</u>

ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের (laxity) বশে অনেকসময় একটা শব্দগুচ্ছের অনেকটা ব্যবহার না করে তার অংশবিশেষ ব্যবহার করা হয়। এতে তার নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।

যেমন- 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া' বলা হয়ে থাকে।

'একটু চা-টা খেয়ে যাও' অথবা 'চায়র সঙ্গে টা না দিলে আমি শুধু চা খাব না'- এখানে 'টা' মান 'জলখাবার'।

'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল এক ধর্ম সম্প্রদায়, এখন তার অর্থ 'হৃদয়হীন'।

ঘ) <u>আলঙ্কারিক প্রয়োগ ঃ-</u>

আলঙ্কারিক অর্থে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকলে শেষে তার অলঙ্কারিক তাৎপর্য হারিয়ে শব্দটি সাধারণ গতানুগতিক অর্থে প্রচলিত হয়ে যায়।

যেমন- সন্ধ্যায় ফোটে বলে একটি ফুলকে সন্ধ্যার মণিস্বরূপ কল্পনা করে আলঙ্কারিক অর্থে তাকে 'সন্ধ্যামণি' বলা হত। এখন একটি ফুলের নামই 'সন্ধ্যামণি' হয়ে গেছে।

'ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়া' অর্থে বলা হয় 'গণেশ ওলটানো'।

‘মিথ্যা কথা বলা’ অর্থে ‘গুলমারা’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। মন্তব্য

‘হাতে ধরা’ বা ‘পায়ে পড়া’ অর্থ ‘মিনতি করা’।

নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শব্দের অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কীকী?

উত্তর ঃ শব্দের অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল- ১) ভৌগলিক

কারণ, ২) ঐতিহাসিক কারণ এবং ৩) উপকরণগত কারণ।

২। সুভাষণ কী?

উত্তর ঃ সাধারণ লোকের ধারণা অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। অশুভ বিষয়কে বা বিপজ্জনক বস্তুকে শুভ বা শোভন নাম দেওয়া হয়, একে সুভাষণ (euphemism) বলে।

১২.৪। অর্থপরিবর্তনের ধারা

অর্থপরিবর্তন তিনটি ধারায় হয়ে থাকে। যেমন-

১) অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning)

২) অর্থসংকোচন (Reduction or Contraction of Meaning)

৩) অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ (Alteration or Transfer of Meaning)

১। **অর্থবিস্তার ঃ-**

কোনো শব্দ যদি প্রথমে কোনো সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে ব্যাপক ভাব না অধিকতর বস্তুকে বোঝায় তবে তাকে ‘অর্থবিস্তার’ বা ‘অর্থপ্রসার’ বলা হয়।

মন্তব্য

যেমন- আগে 'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল 'বর্ষাকাল'; অর্থাৎ বছরের একটিমাত্র সময়। এখন অর্থবিস্তারের ফলে 'বর্ষ' শব্দটি বছরের একটিমাত্র অর্থে ব্যবহার না হয়ে সারাবছর অর্থেই ব্যবহার করা হয়।

আগে 'পরশ্বঃ' শব্দের অর্থ ছিল 'আগামী কালের পরের দিন'। এই 'পরশু' থেকে বাংলায় 'পরশু' শব্দটি এসেছে। এখন এর অর্থবিস্তারের ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'আগামী কালের পরের দিন' এবং 'গতকালের আগের দিন'।

'কালি' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'কালো রঙের তরল পদার্থ। এখন 'কালি' বলতে যেকোনো রঙের লেখার কালিই বোঝানো হয়।

'ধন্য' শব্দের অর্থ ছিল 'বিত্তবান', যার থেকে বর্তমানে অর্থ দাঁড়ায় সৌভাগ্যবান।

২) **অর্থ সংকোচ ঃ-**

প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ভাবকে না বুঝিয়ে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে তাকে অর্থসংকোচ বলা হয়।

যেমন ঃ- প্রথমে সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল 'সব রকমের আলো'। পরে বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় সব রকমের আলো নয়; এক বিশেষ ধরনের আলো যা মাটি বা পিতলের তৈরি।

'মনুষ্য' থেকে বাংলায় আগত 'মুনিস' শব্দের অর্থ সর্বশ্রেণীর মানুষ নয়, শুধুই 'মজুর'।

'কৃপণ' শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'কাতর ও দীনতাযুক্ত' পরে এর সঙ্কুচিত অর্থ হয়েছে 'অর্থব্যয়ে কাতর' বা 'অর্থব্যয়ে অনুদার'।

৩। **অর্থসংক্রম ঃ-**

যখন কোনো শব্দের অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে অন্য বস্তুতে সরে এসেছে বলে মনে হয়, তখন তাকে অর্থসংক্রম বলা হয়।

যেমন- 'ঘর্ম' বলতে বোঝাতো 'গরম'। কিন্তু এখন বাংলায় 'ঘর্ম' শব্দের অর্থ ঘাম বা স্বেদ। মন্তব্য

'পাত্র' শব্দের অর্থ ছিল 'পান করার আধার'। তা থেকে অর্থবিস্তারের ফলে মানে দাঁড়ালো 'যে কোনো রকমের আধার', তাই থেকে অর্থ সংকোচের ফলে মানে দাঁড়ায় 'কন্যা দান করার আধার', এখন সংকীর্ণ অর্থে 'বর'।

'সন্দেশ' শব্দের মূল অর্থ ছিল খবর বা সংবাদ। আত্মীয়ের বাড়িতে দেখা করতে গেলে মিষ্টান্ন নিয়ে যাওয়া হত। এই অনুসঙ্গে ব্যবহারের কারণে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ হয়েছে 'একধরনের মিষ্টান্ন'।

'চামচে' শব্দের অর্থ অর্থসংক্রমের ফলে হয়েছে 'ছোট্ট হাতা' থেকে 'তোষামোদকারী' বা 'অতি অনুগত ব্যক্তি'।

'কন্যা' থেকে বংলায় এসেছে 'কনে' শব্দ, যার অর্থ 'সদ্যো বিবাহিতা স্ত্রী'।

'দারুণ' শব্দের মূল অর্থ 'দারু বা কাষ্টনির্মিত', তার থেকে অর্থ প্রসারে দাঁড়ালো 'কাষ্ঠনির্মিত বস্তুবৎ কঠিন' , তা তেকে 'অত্যন্ত কঠিন', তা থেকে অর্থসংক্রমের ফলে দাঁড়ালো অত্যন্ত।

১২.৫। অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি

উপরিউক্ত ধারাগুলি ছাড়াও শব্দার্থ পরিবর্তনের আরো দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল- অর্থোন্নতি এবং অর্থাবনতি।

অর্থোন্নতি (Elevation or Melioration of Meaning) ঃ-

কোনো শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা অদৃত ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তা হলে তাকে অর্থোন্নতি বলে।

যেমন- 'বাতুল' থেকে আগত 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়'।

'ভোগ' শব্দের মূল অর্থ উপভোগ বা খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত

মন্তব্য হলে 'ভোগ' শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে।

'স্থান' থেকে আগত 'থান' শব্দটি কখনো 'দেবস্থান' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাবনতি (Degeneration or Pejoration of Meaning) ঃ-

কোনো শব্দের অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, শব্দটিতে পূর্বাপেক্ষা হেয় বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝাচ্ছে তাহলে তাকে বলে অর্থাবনতি।

যেমন- 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু অর্থাবনিতর ফলে বোঝায় মহাজন-কারবারীকে অর্থাৎ ঋণ-ব্যবসায়ীকে।

'দেবী' শব্দের অর্থ 'স্ত্রী দেবতা', কিন্তু বর্তমানে মানবীয় নামের সঙ্গেও 'দেবী' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে।

'প্রীতি' শব্দের অর্থ ছিল 'নিষ্কলুষ প্রেম, ভালোবাসা', পরে এই শব্দের অর্ধতৎসম রূপান্তরে হয়েছে 'পিরীতি'। এর ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'সমাজের অনুমোদিত ভালোবাসা'।

এছাড়াও এসেছে মনুষ্য > মুনিষ (labourer) শ্যালক > শালা, উপাধ্যায় > ওঝা > রোজা প্রভৃতি।

নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। অর্থপরিবর্তনের তিনটি ধারা কী কী?

উত্তর ঃ অর্থপরিবর্তনের তিনটি ধারা হল- ১) অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার, ২) অর্থসংকোচ এবং ৩) অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ।

২। অর্থপরিবর্তনের তিনটি প্রধান ধারা ছাড়াও আরো দুটি ধারা কী কী?

উত্তর ঃ অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি।

১২.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। শব্দার্থের পরিচয় বলতে কী বোঝ?

২। শব্দার্থ নিরূপণ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করো।

৩। অর্থপরিবর্তনের ধারাগুলি সম্পর্কে যথাযোগ্য মতামত বিচার করো। মন্তব্য

১২.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

৪। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

একক-১৩ রূপতত্ত্ব

বিন্যাস ক্রম

১৩.১। রূপতত্ত্ব-ভূমিকা

১৩.২। রূপতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

১৩.৩। লিঙ্গের ধারণা

১৩.৪। বচনের ধারণা

১৩.৫। কারকের ধারণা

১৩.৬। সর্বনামের ধারণা

১৩.৭। ক্রিয়ার ধারণা

১৩.৮। নির্বাচিত প্রশ্ন

১৩.৯। সহায়ক গ্রন্থ

১৩.১। রূপতত্ত্ব-ভূমিকা

ভাষার সবচেয়ে ছোটো অর্থপূর্ণ খণ্ড হল রূপ। রূপতত্ত্ব হল ব্যাকরণের সেই অংশ যে অংশে শব্দনির্মাণের প্রক্রিয়া দেখানো হয়। ইংরেজিতে এর নাম হল Morphology। Morphology is "The study of the structure of words." Bloomfield রূপ (Morph)-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল "A minimal meaningful unit of a grammer."

ভাষা বিজ্ঞানের যে অংশে কোনো ভাষার শব্দনির্মাণের পদ্ধতি প্রকরণ আলোচনা করা হয়, তার নাম রূপতত্ত্ব (Morphology)। সেজন্যই রূপতত্ত্ব 'The study of the structure of words' হিসাবে গণ্য। রূপতত্ত্বের আলোচনায় প্রাথমিক একক হিসাবে যা স্বীকৃত তার নাম রূপ (Morph)। রূপ হল "A minimal meaningful unit of a grammer" অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থবহ খণ্ড। রূপের উদাহরণ হিসাবে 'গাছ', 'পথ', 'হাত'; 'আমার'-কথাটির 'আমা' ও 'র'-এই

দুটি অংশ; 'বন্ধুত্ব' কথাটির 'বন্ধু' ও 'ত্ব'-এই অংশ ইত্যাদি উল্লেখ করা চলে। মন্তব্য

উপরের উদাহরণগুলি থেকে দেখা যাবে যে, কোনো কোনো শব্দ একটিমাত্র রূপ দিয়ে গঠিত- সেগুলিকে আর একাধিক অর্থবহ খণ্ডে ভাগ করা সম্ভব নয়। যেমন- 'গাছ', 'পথ', 'হাত', 'চোখ', 'মা'

ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো শব্দ একাধিক রূপের দ্বারা গঠিত। যেমন- 'আমাকে', 'আমার', 'তোমাদের', 'বন্ধুত্ব', 'পাগলামি' ইত্যাদি। যে শব্দগুলি একটিমাত্র রূপের দ্বারা গঠিত। সেগুলিকে বলে সরল বা সিদ্ধ শব্দ (Simple Word)। যে শব্দগুলি একাধিক রূপের দ্বারা গটিত, সেগুলিকে বলে জটিল ও সাধিত শব্দ (Complex Word)।

ভাষাবিজ্ঞানী Leonard Bloomfield রূপগুলির সংগঠন অনুযায়ী সেগুলিকে আরেকদিক থেকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একটি হল মুক্ত রূপ (Free Morph) অর্থাৎ যে রূপগুলি এককভবে অন্য কোনো রূপরে সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- 'গাছ', 'পা', 'হাত', 'পথ', 'Book', 'Man' ইত্যাদি। আর যে রূপগুলি বাক্যে ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো রূপের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, সেগুলিকে তিনি বলেন বদ্ধরূপ (Bound Morph)। ব্যাকরণের বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি সবই বদ্ধরূপ। অন্যদিকে সিদ্ধ শব্দগুলি মুক্তরূপের উদাহরণ।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। Bloomfield রূপের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি লেখো।

উত্তর ঃ Mouph is a minimal meaningful unit of a grammer.

২। Morphology বা রূপতত্ত্ব বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ Morphology is the study of the structure of words.

৩। সিদ্ধ শব্দ কাকে বলে?

মন্তব্য

উত্তর ঃ যে শব্দগুলি একটিমাত্র রূপের দ্বারা গঠিত, সেগুলিকে বলে সরল বা সিদ্ধ শব্দ (Simple word)।

৪। সাধিত শব্দ কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে শব্দগুলি একাধিক রূপের দ্বারা গঠিত, সেগুলিকে বলে জটিল ও সাধিত শব্দ (complex word)।

১৩.২। রূপতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

রূপতত্ত্বের দুটি প্রধান ভাগ হল- শব্দনির্মাণের রূপতত্ত্ব Derivational Morpholoyg) এবং পদনির্মাণের রূপতত্ত্ব (Inflectional Morpholoyg)। প্রথমটি ভাষার বিভিন্ন উপদান যোগ করে নূতন নূতন শব্দ নির্মাণ করে এবং তার ফলে ভাষার অভিধানে শব্দসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়টিতে বাক্যে ব্যবহারের জন্য ভাষায় উপস্থিত শব্দগুলিকে গ্রহণ করে সেগুলিতে নানারূপ বিভক্তি যোগ করে 'পদ' (sentencial word) নির্মাণ করে। ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ অংশে এই পদনির্মাণ হয়। পদগুলি শুধু বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের রূপ মাত্র। বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার আগে শব্দগুলি 'বিশুদ্ধ শব্দ'ই থাকে।

রূপতত্ত্বের তৃতীয় একটি অংশে ভাষায় উপস্থিত শব্দগুলির বাক্যগত ভূমিকা ও প্রয়োগ অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী এই শ্রেণীগুলি নির্ণয় করা হয়। যেমন- বিশেষ্য (Noun), বিশেষণ (Adjective), সর্বনাম (Pronoun), ক্রিয়া (Verb), ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb) ইত্যাদি। এই শ্রেণীবিভাগ শব্দের চরিত্র অনুযায়ী সব ভাষায় অবিকল একধরনের নাও হতে পারে। যেমন- ইংরেজিতে এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় যেখানে Preposition বা পূর্বসর্গ আছে সেখানে বাংলা এবং বহুভারতীয় ভাষায় আছে অনুসর্গ বা Position।

গৌণত রূপতত্ত্বের অংশ হিসাবে ভাষায় অন্যান্য ভাষার উৎস থেকে শব্দের আগমন অর্থাৎ শব্দঋণ (Loan Word) গুলির আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকরণের আলোচনার চেয়ে অনেকসময় ইতিহাসের আলোচনাই প্রধান হয়ে ওঠে। তবুও ইতিহাসের বিভিন্ন কালে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে একটি ভাষার যোগাযোগ ঘটলে

সেই ভাষা যে নূতন শব্দাবলীতে অ-ফেতরযোগ্য ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে সেগুলির নূতন ভাষায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাও অনেকসময় ভাষার রূপতত্ত্ব আলোচনার অংশভুক্ত হয়। এই পরিবর্তনে ধ্বনি এবং অর্থ- দুইই বদলাতে পারে। যেমন- সংস্কৃত 'হস্ত' বাংলায় হাত হয়েছে। এক্ষেত্রে ধ্বনির পরিবর্তন প্রধান। কিন্তু সংস্কৃত 'সন্দেশ' (সংবাদ) বাংলায় একটি বিশেষ 'মিষ্টান্ন' অর্থ পেয়েছে, তা অর্থের পরিবর্তন। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রূপতত্ত্বের প্রধান দুটি ভাগ কী কী?

উত্তর ঃ রূপতত্ত্বের প্রধান দুটি ভাগ হল- শব্দনির্মাণের রূপতত্ত্ব (Derivational Morphology) এবং পদনির্মাণের রূপতত্ত্ব (Inflectional Morphology)।

২। বাক্যগত ভূমিকা ও প্রয়োগ অনুসারে রূপতত্ত্বের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ বিশেষ্য (Noun), বিশেষণ (Adjective), সর্বনাম (Pronoun), ক্রিয়া (Verb), ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb) ইত্যাদি।

১৩.৩। লিঙ্গের ধারণা

বাংলা ভাষায় তিন ধরনের লিঙ্গ স্বীকৃত হয় ঃ- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। পুরুষ জাতীয় বস্তুর নামকে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী জাতীয় বস্তুর নামকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং নপুংসক বা ক্লীব জাতীয় বস্তুর নামকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বিশেষ করে চলিত ভাষায় উপযুক্ত প্রকারের লিঙ্গবিচার বা প্রয়োগ পাওয়া যায় না। আমরা বলি- ''ভালো ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভালো বা সুন্দর মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে, বড়ো ছেলে, বড়ো বউ, বড়ো গাছ, বড়ো ফুল'' ইত্যাদি। কিন্তু সাধু-ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত প্রয়োগের অনুকরণে বহু জায়গায় স্ত্রীলিঙ্গের মতো প্রয়োগ হয়ে থকে। যেমন- ''সুন্দরী দুহিত, কন্যা, রমনী; বিদ্বান পুরুষ, বিদুষী নারী; মহীয়সী মহিলা, প্রধানা নায়িকা, রত্নগর্ভা জননী, কোকিল কণ্ঠী গায়িকা, মুখরা

মন্তব্য প্রগল্‌ভা স্ত্রী; সাধ্বী, পতিব্রতা নারী" ইত্যাদি। কয়েকটি ক্লীবলিঙ্গের উদাহরণ - ''অর্থকরী বিদ্যা, পরা বিদ্যা, সর্বাং সহা ধরিত্রী, ধৈর্য্যশীলা নারী, স্বর্ণময়ী কাশী" ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-রূপ দুই প্রকারের হয় ঃ- ১) সেই শ্রেণীর বা জাতির স্ত্রীলোক বোঝাবার জন্য এবং ২) কোনো শ্রেণী বা জাতির পুরুষের পত্নীকে বোঝানোর জন্য। যেমন ঃ- নাতি, নাতনী, নাত-বউ ইত্যাদি।

১) **পৃথক শব্দ দ্বারা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ**

ক) বাংলা শব্দ ঃ- ''বাবা, বাপ- মা; ছেলে-মেয়ে, বউ; ভাই- বোন, ভগ্নি; পো- ঝি, বউ; জামাই- মেয়ে; ভাশুর, দেবর, দেওর- ননদ; দাদা- দিদি; জামাইবাবু-দিদি।

খ) সংস্কৃত শব্দ ঃ- ''পিতা-মাতা; জনক-জননী; স্বামী-স্ত্রী; পতিপত্নী; বর-বধূ; যুবা, যুবক-যুবতী; নর-নারী; পুত্র-কন্যা; রাজা-রানী।

গ) বিদেশী শব্দ ঃ- ''বাদশা, নবাব-বেগম; সাহেব-বিবি; মিস্টার-মিস, মিসেস; সাহেব-বিবি, মেম; চাকর-ঝি, চাকরানী; খানসামা-আয়া; দুলা-দুল্‌হিন্‌; ভাই-ভাবী ইত্যাদি।

২) **সাধারণ শব্দে পুরুষ অথবা স্ত্রী-বাচক শব্দ-যোগে লিঙ্গ-নির্দেশ**

''বেটা-মেয়ে; নর-নারী; মদ্দা-মাদী; বেটা ছেলে-মেয়েছেলে; কবি-মেয়েকবি, স্ত্রী-কবি; মহিলা-কবি; মন্দা চিল বা নর-চিল-মাদী-চিল, স্ত্রী-চিল; মর্দা উট-মাদী উট বা উটনী" ইত্যাদি।

অনেক জায়গায় উভয়লিঙ্গ বাচক একমাত্র শব্দ দ্বারা কাজ চলে, বাক্যের অর্থ ধরে লিঙ্গ নির্ণয় করতে হয়। যেমন ঃ- ''গোরুতে গাড়ী টানে; গোরু দুধ দেয়" ইত্যাদি

৩) **পুং-বাচক নামের শেষে প্রত্যয়-যোগে স্ত্রী-বাচক নাম-গঠন**

ক) বাংলা প্রত্যয় ঃ-

১। ''-ঈ" প্রত্যয় যোগে- কাকা-কাকী; খুড়া-খুড়ী; মামা-মামী; জেঠা-জেঠী; সৎ-সতী; বামুন-বামুনী; ঘোড়া-ঘুড়ী; পেটুক-পেটুকী; মুসলমান-মুসলমানী;

ভাগিনী-ভাগ্নী; মোরগ-মুরগী; ভেড়া-ভেড়ী; ডাহুক-ডাহুকী" ইত্যাদি। মন্তব্য

২। "-৯" প্রত্যয় যোগে- "নাতি-নাতনী; কামার-কামারনী; কামার-কামারনী; কুমার-কুমারনী; কায়েত-কায়েতনী; গোয়ালা-গোয়ালিনী; ভিখারী-ভিখারিনী; নাপিত-নাপিতানী; ডোম-ডোমনী ইত্যাদি।

খ) <u>সংস্কৃত প্রত্যয় ঃ-</u>

১। "আ" প্রত্যয় যোগে- "বৈবাহিকা; দ্বিজা; আর্য্যা; কৃশা; স্থূলা; প্রাচীনা; মহাশয়া; সদাশয়া; মাতুলা; বলাকা; প্রবীণা; নবীনা; সরলা; কোকিলা; অশ্বা; চটকা; ক্রোঞ্চা; কুটিলা; নিবেদিতা; মৃতা; জীবিতা; পণ্ডিতা; মূর্খা; সেবিকা" ইত্যাদি।

২। "-আনী" প্রত্যয় যোগে- "ভবনী; ব্রহ্মাণী; ইন্দ্রাণী; মহেন্দ্রাণী; বরুণানী; মাতুলানী; উপাধ্যায়ানী; শুদ্রাণী; ক্ষত্রিয়াণী; বৈশানী; আচার্য্যানী; হিমানী; অরণ্যানী; বনানী" ইত্যাদি।

৩। "-ইকা" বা "-অক" প্রত্যয় যোগে- "লেখিকা; নাচিকা; প্রচারিকা; সংস্কারিকা; বালিকা; বাহিকা; চালিকা; ভক্ষিকা; প্রেরিকা; শিক্ষিকা; ঋষিকা; ব্রাহ্মিকা" ইত্যাদি।

৪। "-ঈ" প্রত্যয় যোগে- "নারী; নদী; অনুচরী; সহচরী; অর্থকারী; প্রলয়ঙ্করী; শুভঙ্করী; কিঙ্করী; সাদৃশী; জলময়ী" ইত্যাদি।

৫। কতকগুলি শব্দের বিকল্পে "আ" বলা "ঈ" হয়। যেমন ঃ- "বিশাল-বিশালা, বিশালী; চণ্ড-চণ্ডা, চণ্ডী; কৃপণ-কৃপনা, কৃপণী; কামুক-কামুকা, কামুকী; ভাবুক-ভাবুকা, ভাবুকী" ইত্যাদি।

৬। বহুব্রীহি-সমাসের পরবর্তী, অঙ্গ-বাচক শব্দে বিকল্পে "ঈ" বা "-অ" হয়। যেমন ঃ- "মুকশা, মুকেশী; চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী; তাম্রনীখ; সুদন্তা, সুদন্তী, সুদতী" ইত্যাদি।

গ) <u>স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গ ঃ-</u>

কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের আধারের উপর প্রস্তুত হয়েছে। যেমন ঃ- "নন্দাই, বোনাই, পিসা, মেসো" ইত্যাদি।

মন্তব্য

ঘ) **দুই-একটি শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ বা নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ঃ-**

''বিপত্নীক; সভাপতি; অঙ্গনা; বিধবা'' ইত্যাদি।

ঙ) **বিদেশী স্ত্রী প্রত্যয় ঃ-**

১) তুর্কী ''অম্''; ''বেগ্-বেগ্ম; খান্-খানুম্''; ২) আরবি-ফারসি ''-অহ্-আ''; ''সুলতান-সুলতানা; মালিক-মালিকা; মাহমুদ-মাহমুদা'' ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। লিঙ্গ কয়প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ লিঙ্গ সাধারণ তিনপ্রকার - পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ।

২। ''ই'' প্রত্যয় যোগ করে লিঙ্গের দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ কাকা-কাকী; খুড়া-কুড়ী।

৩। ''ইকা'' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গের দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ লেখক-লেখিকা; পাচক-পাচিকা।

১৩.৪। বচনের ধারণা

যা একটি অথবা একটির বেশি যে-কোনো সংখ্যাকে বোঝায় তাকে বচন বলে।

বচন দুই প্রকার- একবচন ও বহুবচন।

বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন হয়।

বিশেষ্য পদের একবচন

ক) আমরা চাঁদ দেখি।

খ) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

গ) মন্ত্রী বলললেন।

ঘ) হান্সের মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এগুলি সব একবচন। সংখ্যা বা বচন বোঝানোর জন্য এখানে বিশেষ্য পদের সঙ্গে অন্য কিছু যোগ হয়নি। মন্তব্য

ক) বইটা দাও।

খ) পুস্তকটি রাখো।

গ) কাপড়খানা রোল মেলে দাও।

ঘ) গামছাখানি বেশ শক্ত।

ঙ) লাঠিগাছা বেশ শক্ত।

চ) দড়িগাছি নিয়ে বাঁধা।

প্রতিটি উদাহরণে বিশেষ্য পদের পরে যথাক্রমে টা, টি, খানা খানি, গাছা, গাছি যোগ করে একবচন হয়েছে।

ক) একটি গোরু চরছে।

খ) একটি পাখি উড়ে গেল।

গ) একখানা চেয়ার আনো।

উদাহরণগুলিতে গোরু, পাখি এবং চেয়ারের সংখ্যা বোঝাতে যথাক্রমে একটি, একটা এবং একখানা ব্যববহার করা হয়েছে।

বিশেষ্য পদের বহুবচন

১। বিশেষ্য পদের সঙ্গে রা, এরা, দের, দিগকে প্রভৃতি শব্দ যোগ করে বহুবচন করা হয়।

যেমন ঃ-

ক) ছাত্ররা বই পড়ে।

খ) বালকেরা মাঠে খেলে।

মন্তব্য

২। একই বিশেষ্য পদ পরপর দুবার ব্যবহার করে বহুবচন করা হয়। যেমন ঃ-

ক) লোকটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে জিনিস বেচে।

খ) কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি।

গ) তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান।

ঘ) ঘরে ঘরে অসুখ লেগেই আছে

৪। বহুবচনসূচক সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদ আগে বসিয়ে বিশেষ্য পদের বহুবচন করা হয়। যেমন ঃ-

ক) সকল মানুষ মরণশীল।

খ) অনেক লোক সভায় যোগ দিল।

গ) অসংখ্য পাখি উড়ে গেল।

ঘ) সে প্রচুর মিষ্টি খেল।

ঙ) পৃথিবীতে বহু দেশ আছে।

৫। বিশেষ্য পদের পরে কুল, বর্গ, সমূহ ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন করা হয়। যেমন ঃ-

ক) কৃষ্ণবর্গ এই আবেদন রাখল।

খ) ছাত্রমহল তাঁর গুণকীর্তন করে।

সর্বনাম পদের একবচন

ক) আমি ভাত খাই।

খ) আমাকে একটি বই দাও।

গ) আমার বাড়ি বর্ধমানে।

ঘ) তুমি কোথায় যাও?

ঙ) তোমার কথা শুনেছি। মন্তব্য

সর্বনাম পদের বহুবচন

ক) আমরা ভাত খাই।

খ) আমাদেরকে একটি বই দাও।

গ) আমাদের বাড়ি বর্ধমানে।

ঘ) তোমরা কোথায় যাও?

ঙ) তারা ভাত খায়।

চ) তাদেরকে কিছু বোলো না।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বচন কাকে বলে?

উত্তর ঃ যা একটি অথবা একটির বেশি যে-কোনো সংখ্যাকে বোঝায়, তাকে বচন বলে।

২। বচন কয়প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ বচন দুই প্রকার - একবচন, বহুবচন।

৩। কোন্ কোন্ পদের বচন হয়?

উত্তর ঃ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন হয়।

১৩.৫। কারকের ধারণা

বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্বন্ধকে কারক বলে। বাংলা ভাষায় কারক ছয় প্রকার ঃ- ১) কর্তৃকারক, ২) কর্মকারক, ৩) করণকারক, ৪) নিমিত্তকারক, ৫) অপাদানকারক এবং ৬) অধিকারণকারক।

মন্তব্য

১। কর্তৃকারক

যে পদ ক্রিয়া সম্পাদনা করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন ঃ-

ক) মা গর্জন করে ডাকে।

খ) হান্স তাড়াতাড়ি বাড়িমুখো পা চালাল।

গ) মন্ত্রী মশাই রেগে বললেন।

ঘ) আমি ভুতুবাবুকে আনা দুয়েকের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি।

ঙ) রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন।

২। কর্মকারক

কর্তা যে কাজ সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন ঃ-

ক) গোপালকে খাঁবো।

খ) ধবলীরে আনো গোহালে।

গ) ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।

ঘ) মানুষ বীর হান্সকে দেখতে এল।

ঙ) তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলেন।

৩। করণকারক

কর্তা যার দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণকারক বলে। যেমন ঃ-

ক) আমি কলম দিয়ে লিখি।

খ) মা খুন্তি নিয়ে রান্না করে।

গ) তারা ছুরি দিয়ে আম কাটে।

ঙ) আমরা চোখ দিয়ে দেখি।

৪। নিমিত্তকারক মন্তব্য

ক্রিয়ার দ্বারা কোনো পদরে উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত বোঝালে ওই পদে নিমিত্তকারক হয়।

যেমন ঃ-

ক) ফুল দেবতার পূজায় লাগে।

খ) ভিক্ষুকটি ভিক্ষায় বের হল।

গ) সে ঘোড়ার ঘাস কাটে।

ঘ) তাঁরা আলোচনায় বসলেন।

ঙ) সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করো।

৫। অপাদান কারক

যা থেকে কোনো কিছু বিশ্লিষ্টি বা উৎপন্ন হয়, তাকে অপাদানকারক বলে। যেমন ঃ-

ক) বাচ্চারা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে।

খ) মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।

গ) হিমালয় থেকে গঙ্গা নদী বেরিয়েছে।

৬। অধিকরণকারক

যে সময়ে বা যে স্থানে বা যে বিষয়ে কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ক্রিয়ার সেই আধারকে অধিকরণকারক বলা হয়। যেমন ঃ-

ক) মাছ জলে থাকে।

খ) তিনি সন্ধ্যায় গান করেন।

গ) ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কারক কাকে বলে?

মন্তব্য

উত্তর ঃ বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্বন্ধকে কারক বলে।

২। কর্ত্তৃকারকের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ মা গর্জন করে ডাকে।

৩। নিমিত্তকারকের একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ ভিক্ষুকটি ভিক্ষায় বের হল।

৪। একটি অধিকরণকারকের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ তিনি বারুইপুরে থাকেন।

১৩.৬। সর্বনামের ধারণা

বাক্য মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত অথবা অজ্ঞাত কোনো সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যেসকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাকে সর্বনাম বলে।

যেমন - তার, সে ইত্যাদি।

সর্বনাম নানা প্রকারের হয়। যেমন ঃ-

১। ব্যক্তিবাচক বা পুরষ বাচক (Personal);

২। উল্লেখসূচক বা নির্ণয় সূচক (Demonstrative);

ক) প্রত্যক্ষ বা অন্তিক-নির্ণয়-সূচক (Proximate বা Near Demonstrative);

খ) পরোক্ষ বা দূরস্থ-নির্ণয়-সূচক (Remote বা Demonstrative);

৩। সাকল্যবাচক (Inclusive);

৪। সম্বন্ধ, সংযোগ বা সঙ্গতিবাচক (Relative);

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। সর্বনাম কাকে বলে?

উত্তর ঃ বাক্যমধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত অথাব অজ্ঞাত কোনো সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যেসকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাকে সর্বনাম বলে।

২। সর্বনামের দুটি প্রকারের নাম লেখো।

উত্তর ঃ ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম এবং সাকল্যবাচক সর্বনাম।

১৩.৭। ক্রিয়ার ধারণা

ক্রিয়া দুঠেই প্রকার - সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়া।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলার থাকে, তা যে ক্রিয়া পদ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বলা যায়, যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ শেষ করে দেওয়া যায়, বলবার আর কিছুই থাকে না, সেইরূপ ক্রিয়াপদকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ- ''আমি যাই'', ''তারা গান গাইছে''।

যেখানে কোনো ক্রিয়াপদ, উদ্দেশ্যের বিধেয় হয়েও সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলে না, বাক্যটির অর্থ পুরো করে দেয় না- বাক্য শেষ করতে হলে যেখানে অন্য ক্রিয়া-পদের অপেক্ষা থাকে, সেখানে তদ্রুপ ক্রিয়াপদকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ- ''আমি ভাত খেয়ে'', ''তারা নাচতে নাচতে'' ইত্যাদি।

ক্রিয়ার কাল

যে সময়ে বা কালে ক্রিয়াটি ঘটে তাকে ক্রিয়ার কাল বলে। এই কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ-

১। বর্তমান কাল

২। অতীত কাল

৩। ভবিষ্যত কাল

মন্তব্য

১। **বর্তমান কাল ঃ-** যে ক্রিয়া ‘এখনকার কোনা কাজ’কে বোঝায় তার কালকে বর্তমান কাল বলে। যেমন ঃ-

ক) আমি ভাত খাই।

খ) আমি বিদ্যালয়ে যাইতেছে।

গ) তুমি বাড়ি যাও।

ঘ) তোমরা ফুটবল খেলো।

২। **অতীত কাল ঃ-** যে ক্রিয়া ‘আগে হয়ে যাওয়া কোনো কাজ’ কে বোঝায় তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন ঃ-

ক) আমি ভাত খাইতাম।

খ) আমরা বিদ্যালয়ে যাইতেছিলাম।

গ) তুমি বাড়ি গিয়াছিলে।

ঘ) তোমরা ফুটবল খেলিয়াছিলে।

ঙ) সে ভাত খাইয়াছিল।

চ) তাহারা ফুল তুলিয়াছিল।

৩। **ভবিষ্যত কাল ঃ-** যে ক্রিয়া ‘পরে হবে এমন কোনো কাজ’কে বোঝায় তাকে ভবিষ্যত কাল বলে। যেমন ঃ-

ক) আমি ভাত খাইব।

খ) আমরা বিদ্যালয়ে যাইতে থাকিব।

গ) তুমি বাড়ি যাইবে।

ঘ) সে ভাত খাইবে।

ঙ) তোমরা ফুটবল খেলিবে।

চ) তাহারা ফুল তুলিবে। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ক্রিয়াকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ ক্রিয়ার দুটি ভাগ - সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাকিা ক্রিয়া।

২। ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে সময়ে বা কালে ক্রিয়াটি ঘটে, তাকে ক্রিয়ার কাল বলে।

৩। ক্রিয়ার কাল কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার ঃ- বর্তমান কাল, অতীত কাল এবং ভবিষ্যত কাল।

৪। একটি বর্তমান কালের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ আমরা বিদ্যালয়ে যাইতেছি।

৫। একটি অতীত কালের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ তোমরা ফুটবল খেলিয়াছিলে।

৬। একটি ভবিষ্যত কালের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ তাহারা ফুল তুলিবে।

১৩.৮। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। রূপতত্ত্ব বলতে কী বোঝ?

২। রূপতত্ত্বের শ্রেণীভাগ করে দেখাও।

৩। লিঙ্গ সম্পর্কে ধারণা দাও।

৪। বচন, কারক, সর্বনাম ও ক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

মন্তব্য

১৩.৯। সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৪। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

একক-১৪ বাক্যতত্ত্ব

বিন্যাস ক্রম

১৪.১। বাক্যতত্ত্ব–ভূমিকা

১৪.২। বাংলা বাক্যের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ

১৪.৩। শুদ্ধ বাক্যের ত্রি-সূত্র

১৪.৫। বাক্যের পদবিধি

১৪.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১৪.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১৪.১। বাক্যতত্ত্ব-ভূমিকা

ইংরেজি Syntax শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় 'বাক্যতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি এই Syntax কথাটি এসেছে গ্রীক Syntaxis থেকে। গ্রীক ভাষায় এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন গ্রীক বৈয়াকরণ দিওনুসিওস্ থ্রাক্স।

অর্থাৎ বাক্য হচ্ছে এমন কতগুলি নির্বাচিত উপাদানের পরম্পাক্রমিক বিন্যাস যেগুলিকে ভাষাবিশেষে বিশেষ ছাঁদ, রূপপরিবর্তন ও সুরতরঙ্গের বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত করে একটি একক রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। বাক্যের উপাদান বা শব্দগুলিকে বাক্যের মধ্যে যে মিলিত করা হয় তাদের সেই মিলনের ব্যাপারে ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে। এই নিয়মের দুটি দিক হল- বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি সাজাবার বা বিন্যাসের নিয়ম আর বাক্যের প্রয়োজন অনুসারে শব্দগুলির রূপপরিবর্তনের নিয়ম। বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির বিন্যাস অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কোন্ শব্দ কোথায় বসবে এবং তাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক কী রকম হবে তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলে ব্যাক্যতত্ত্ব (Syntax)। আর বাক্যে ব্যবহৃত হলে বিভিন্ন শব্দের যে রূপপরিবর্তন হয় তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে বলে রূপতত্ত্ব (Morphology)। চীনা প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত হলে শব্দের কোনো রূপগত পরিবর্তন হয় না।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বাক্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোনো ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়।

২। রূপতত্ত্ব কাকে বলে?

উত্তর ঃ বাক্যে ব্যবহৃত হলে বিভিন্ন শব্দের যে রূপপরিবর্তন হয় তা ভাষা-বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলে।

১৪.২। বাংলা বাক্যের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ

ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে বাক্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate)। ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

১। সরল বাক্য (Simple Sentence);

২। জটিল বা মিশ্র বাক্য (Complex Sentence);

৩। যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compound Sentence)।

১। **সরল বাক্য ঃ-** যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয থাকে, তাকে সরল বাক্য (Simple Sentence) বলে।

যেমন ঃ- ‘‘ছাত্রেরা পড়ে।’’

২। **জটিল বাক্য ঃ-** যে বাক্যে একটি উপবাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা আশ্রিত উপবাক্য থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য (Complex Sentence) বলে।

যেমন ঃ- ‘‘ছাত্রটি যদি পড়ে, তবেই সে পাশ করবে।’’

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে বাক্যকে কয়টি বাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে বাক্যকে দুটি বাগে ভাগ করা যায় - উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

২। সরলবাক্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে, তাকে সরলবাক্য বলা হয়।

৩। জটিল বাক্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা আশ্রিত উপবাক্য থাকে, তাকে জটিলবাক্য বলা হয়।

১৪.৩। শুদ্ধ বাক্যের ত্রি-সূত্র

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ বলেছিলেন - বাক্য হল যোগ্যতা, আকাঙ্খা ও আসত্তি-যুক্ত পদ-সমুচ্চয়। এই সূত্র অনুসারে শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের জন্যে তিনটি শর্ত নির্ণিত হয়েছে

১। আকাঙ্খা (Expectance);

২। যোগ্যতা (Compatibility or Propriety);

৩। আসত্তি বা নৈকট্য (Pronimity)।

১। **আকাঙ্খা ঃ-** কোনো বাক্যের বক্তব্য পূর্ণ রূপ জনার জন্য শ্রোতার মনে যে আকাঙ্খা বা কৌতুহল থাকে বাক্যের দ্বারা তা নিবৃত্ত হওয়া চাই।

২। **যোগ্যতা ঃ-** বাক্যের অর্থ অর্থাৎ বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞাতার বা বৃহত্তর বা গভীরতর সত্যের যে সঙ্গতি থাকে তাকে যোগ্যতা বলা হয়।

৩। **আসত্তি ঃ-** আসত্তি বলতে বোঝায় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি ও বিন্যাসের নৈকট্য বা ক্রম। বাক্যে বিন্যস্ত পদগুলির মধ্যে রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি থাকা চাই।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শুদ্ধ বাক্যের ত্রিসূত্র কী কী?

উত্তর ঃ শুদ্ধ বাক্যের ত্রি-সূত্র হল ঃ- ১) আকাঙ্খা, ২) যোগ্যতা এবং ৩) আসত্তি বা নৈকট্য।

২। আকাঙ্খা বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ কোনো বাক্যের বক্তব্য পূর্ণ রূপে জানার জন্য শ্রোতার মনে যে আকাঙ্খা বা কৌতূহল থাকে বাক্যের দ্বারা তা বৃত্ত হওয়া চাই।

৩। যোগ্যতা কাকে বলে?

উত্তর ঃ বাক্যের অর্থ অর্থাৎ বক্তার বক্তেব্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা বা বৃহত্তর বা গভীরতর সত্যের যে সঙ্গতি থাকে, তাকে যোগ্যতা বলা হয়।

১৪.৫। বাক্যের পদবিধি

সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো, ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধহীন। তবে কোনো কোনো ক্রিয়াযোগে সম্বন্ধ পদ অপরোক্ষ কর্মকারক হয়। যেমন ঃ- এ বই আমার আছে। তোমার ভয করছে না?

করণ কারকের পদ সহযোগিতা বা পারস্পরিকতাও বোঝাতে পারে। যেমন ঃ- বাপ বেটায় খুব লেগেছে, চোরে কামারে দেখা নেই।

করণ ষষ্ঠী ঃ- হাতের কাজ, চোখের দেখা, কুলির লেখা, পায়ে ঠেলা।

কর্ম ষষ্ঠী ঃ- গ্রন্থের ব্যাখ্যা, শিশুর পরিচর্যা, ধানের কাটতি, রান্নার ব্যবস্থা, চোরের মার।

উদ্দেশ্য ষষ্ঠী ঃ- রান্নার জোগাড়, স্টেশনের রাস্তা, চলার পথ, বেচার মাল, মহাজনের দেনা।

কর্তা ষষ্ঠী ঃ- রবীন্দ্রনাথের লেখা, গিন্নীর কাজ, গাড়ির দৌড়, ধানের ফলন, ছেলের ঘুম।

অধিকরণ পদে জোর দিতে হলে উপর, ভিতর, মাঝে, মধ্যে, মধ্যিখানে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মন্তব্য

অতিশায়ন অর্থে, ষষ্ঠী অথবা বিভক্তিহীন পদের সঙ্গে 'চেয়ে, থেকে, হতে, করতে ইত্যাদি অসমাপিকা যুক্ত হয়। অথবা বিশেষণের সঙ্গে শুধু ষষ্ঠী পদই চলে। যেমন ঃ- তার বড়ো নেই। রাম বয়সে সবার বড়ো।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। করণ ষষ্ঠীর দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ হাতের কাজ, চোখের দেখা।

২। উদ্দেশ্য ষষ্ঠীর দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ রান্নার জোগাড়, চলার পথ।

৩। কর্তা ষষ্ঠীর দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা, গিন্নীর কাজ।

১৪.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বাক্যতত্ত্ব বলতে কী বোঝ?

২। বাক্যতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ আলোচনা করো।

৩। বাংলা বাক্যের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ উদাহরণ সহকারে আলোচনা করো।

৪। বাক্যের ত্রি-সূত্র বলতে কী বোঝ?

৫। বাক্যের পদবিধি উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করো।

১৪.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।